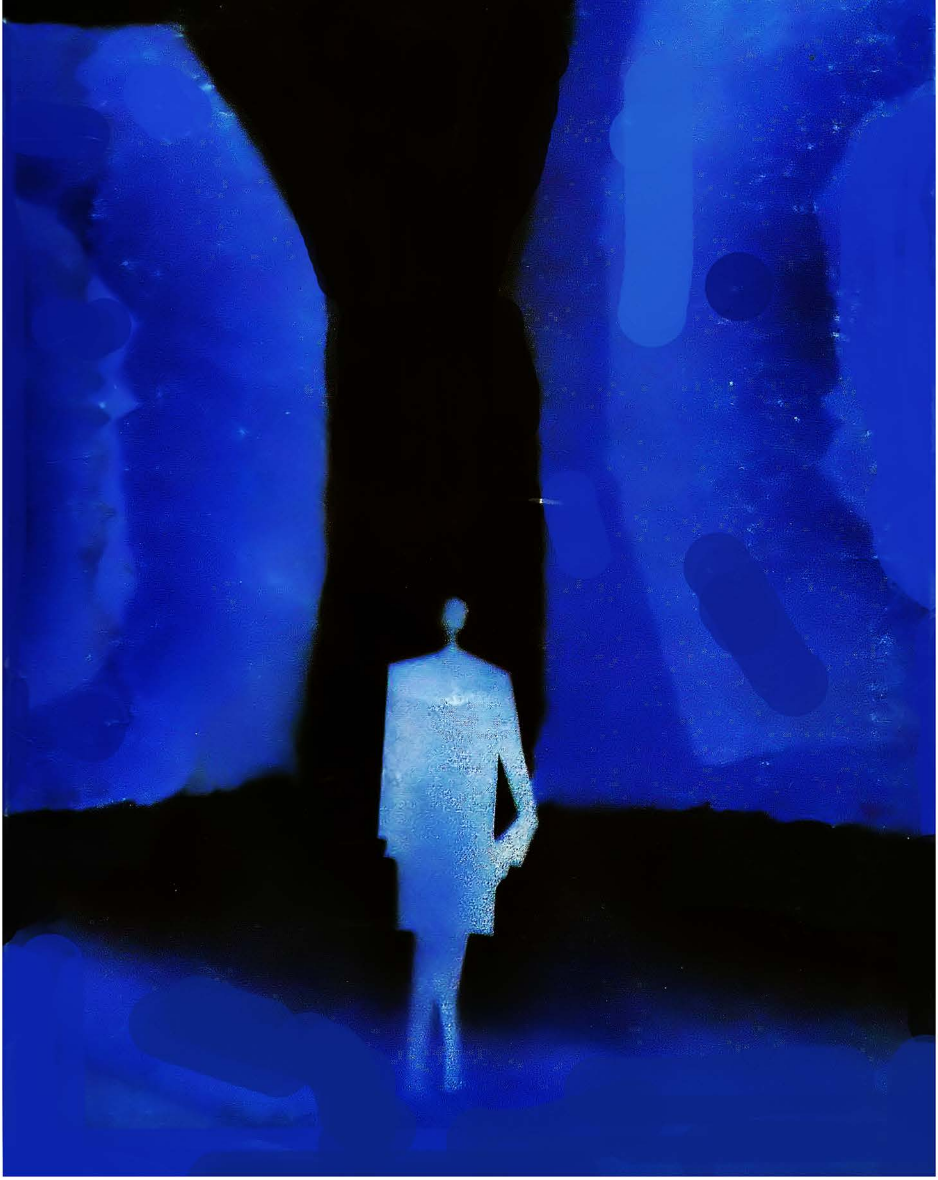
ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি

অজ্ঞাতবাসের পত্র



ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি
অজ্ঞাতবাসের পত্র

অজ্ঞাতবাসের পত্র

ফিয়োদর দস্তয়ভস্কির
'নোটস্ ফ্রম আন্ডার গ্রাউন্ড'-এর
বাংলা অনুবাদ

খন্দকার মজহারুল করিম

ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি

অজ্ঞাতবাসের পত্র

অনুবাদ

খন্দকার মজহারুল করিম

প্রিপ ট্রাস্ট

ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি
অজ্ঞাতবাসের পত্র

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ

প্রকাশনায়
প্রিপ ট্রাস্ট
৫৯/এ সাত মসজিদ রোড
ধানমণ্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল
মার্চ ১৯৯৭

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা–১০০০

মুদ্রণ
ব্রাক প্রিন্টার্স

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ষাট টাকা

NOTS FROM UNDERGROUND BY FYODOR DOSTOEVSKY
TRANSLATED BY KHANDAKAR MAZHARUL KARIM

প্রিপ ট্রাস্ট–এর মাধ্যমে ইউনাইটেড স্টেটস্ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID)–এর কো–অপারেটিভ চুক্তি নম্বর ৩৮৮–০০৭২–এ০০–৮১০৪ শর্তানুসারে প্রদত্ত আর্থিক অনুদানে এই গ্রন্থ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত একান্তই প্রণেতাদের। প্রতিফলিত মতামতের জন্য USAID কিংবা প্রিপ দায়ী নহে।

উৎসর্গ

কবি শামসুর রাহ্‌মান
শব্দের ছন্দোবন্ধনে যিনি এনে দেন
আলোয় আলোয় আত্মার মুক্তি
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম অধ্যায়

ভূগর্ভবাস

এক

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে। কী যে বাজে অবস্থা! মনে হচ্ছে লিভারে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। অসুখটা ঠিক কী, জানি না। কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তাও ঠিক করে বলতে পারব না। ওষুধ আর ডাক্তারের ওপর ভক্তি আছে, তবু ডাক্তার দেখাচ্ছি না। ওই কাজটা কখনই আমাকে দিয়ে হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, আমার কুসংস্কার মারাত্মক। অন্তত ওষুধের ভক্ত হবার পক্ষে তো বটেই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হবার মতো বিদ্যে আমার আছে, তবু কুসংস্কার ছাড়তে পারি নি। তবে সেজন্য নয়, ডাক্তার দেখাই নি স্রেফ রাগে। আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। অবশ্য আমার রাগে সর্বনাশটা ঠিক কার হবে, বলতে পারব না। খুব ভালোভাবেই জানি, আমি ডাক্তার না দেখালে ডাক্তাররা না-খেয়ে মরবে না। কারুর কিচ্ছু হবে না, শুধু আমিই মরব—সেটা আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে? তারপরও, কেবলমাত্র রাগে ডাক্তার দেখাই না। লিভারের অবস্থা খারাপ। দূর, মরুক গে লিভার।

অনেকদিন ধরেই তো এভাবেই যাচ্ছে—বিশ বছর। এখন আমার চল্লিশ চলছে। এক সময় সরকারি চাকরি করতাম। চাকরিটা নেই। বদমেজাজি অফিসার ছিলাম। মেজাজ খারাপ করতাম যখন-তখন ; সেটাই ভালো লাগত। ঘুস খেতাম না। সেটা পুষিয়ে নেবার জন্য একটা কিছু তো করা চাই। তাই ওই বদমেজাজে তামাশাও বলতে পারেন ব্যাপারটাকে। কিন্তু এ-নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে চাই না। খুব বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে—এই ভেবে বললাম আর কি। এখন দেখছি বাহাদুরি দেখানো ছাড়া আর কিছু হল না—তাও জঘন্য কায়দায়। যাক, আর খোঁচাখুঁচি করব না।

লোকে যখন দরখাস্ত নিয়ে আমার টেবিলের সামনে আসত, তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতাম। সফলভাবে কারুর মন খারাপ করে দিতে পারলে কী যে মজা লাগত! এ ব্যাপারে প্রায় সব সময়ই সাফল্য নিশ্চিত ছিল। আর আসত তো বেশির ভাগ ছা-পোষা লোকজন। আমার কর্তাদের একজন ছিল একটু অন্য ধরনের। তাকে একদম সহ্য করতে পারতাম না। বিনয় বলতে তাঁর কিছু ছিল না।

সব সময় তরোয়াল দিয়ে বিশ্রী ঠনঠন শব্দ করতেন। তরোয়ালের ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটানা আঠার মাস ঝগড়া হয়েছে আমার। শেষ পর্যন্ত তাকে কাবু করতে পেরেছি। ঠনঠনানি বন্ধ হয়েছে। সে অবশ্য আমার যৌবনকালের কথা।

আমার রাগের মূল কারণ কী ছিল, সেটা এবার খুলে বলি। সব সময়, এমনকি প্রচণ্ড রাগের মুহূর্তেও মনের গোপনে এই সলজ্জ চেতনা আমাকে ছুঁয়ে যেত যে বদমেজাজি হবার ক্ষমতাই আমার মধ্যে নেই। এমনকি রাগীও বলা যায় না আমাকে। আমি তো কেবল চড়ুই পাখিদের ভয় দেখিয়ে মজা পাই। যখন খুব রাগ ওঠে, একটা পুতুল এনে দাও, কিংবা সামনে ধরিয়ে দাও চিনি-দেয়া এককাপ চা, অমনি রাগটা গলে পানি হয়ে যাবে। কখনও কখনও হয়তো সত্যি পাগলামি করে ফেলি। কিন্তু পরে নিজেই মরমে মরে গিয়ে তন্দ্রাহারা রাত কাটাই মাসের পর মাস। এইরকমই ছিলাম আমি।

এই যে বললাম, বদমেজাজি অফিসার ছিলাম, এটা কিন্তু বিলকুল মিথ্যে কথা। মিথ্যে বলেছি রাগে। আসলে কী হত জানেন? অফিসে যেসব আবেদনকারী আসত, তাদের দেখে আমার মজাই লাগত। ওই হোমরাচোমরাটির ব্যাপারেও এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। আসলে সত্যিকার কিছু মেজাজ খারাপ কখনই করতে পারি নি। বরং এর ঠিক বিপরীত এমন অনেক কিছু আছে আমার ভিতরে—যেগুলোর বিষয়ে আমি সদা সচেতন। এই বিপরীতধর্মী বিষয়গুলো আমার ভিতরটাকে নিয়তির মতো আঁকড়ে ধরে আছে। জানি, সেগুলো সারাজীবন ধরেই আমাকে আঁকড়ে আছে আর চাইছে নির্গমনের পথ। কিন্তু আমি তো তাদেরকে বেরুতে দেব না। কিছুতেই না। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দেব না। যতক্ষণ লজ্জায় মুষড়ে না পড়েছি ততক্ষণ তারা আমাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। আমার শরীরে প্রচণ্ড পীড়ন করেছে, শেষ পর্যন্ত অসুস্থ করেছে ভয়ঙ্করভাবে। আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, কোনো কিছুর জন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে। আর এখন তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব। তাই না? নিশ্চয় তাই ভাবছেন....যাক, আপনাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমার কিছুই যায়-আসে না, যদি আপনারা....

আমি যে বদমেজাজি হতে পারি নি শুধু তা-ই নয়। বুঝতে পারি নি কী করলে কী হওয়া যায়। মেজাজি কিংবা সদাশয় ; শঠ কিংবা সৎ ; বীরপুরুষ কিংবা নগণ্য কীট ; কিছুই না। আজ নিজের ঘরের কোণে জীবনটা নেড়েচেড়ে কাটাচ্ছি আর বোকার মতো অভিমানভরে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে, মেধাবী মানুষ শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিকভাবে কিছুই হয়ে উঠতে পারে না, আর কিছু একটা হয়ে ওঠা নির্বোধেরই কম্ম। হ্যাঁ, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষকে অবশ্যই নৈতিকভাবে হতে হবে খাঁটি চরিত্রহীন প্রাণী। চরিত্রবান আর কাজের মানুষদের অনেক সীমাবদ্ধতা। এটা আমার চল্লিশ বছরের প্রত্যয়। আমার বয়স চল্লিশ। জানেনই তো, চল্লিশ বছর মানেই সারাজীবন ; জানেনই তো সে অনেক বয়স। চল্লিশ বছরের বেশি বেঁচে থাকা স্রেফ অভদ্রতা, অসভ্যতা, অনৈতিক। চল্লিশের পর কে ঠিকমতো বেঁচে

থাকে? অকপটে, সততার সঙ্গে এর উত্তর দিন তো! আমি বলছি, কে বেঁচে থাকে বেঁচে থাকে নির্বোধ আর অকর্মা লোকেরা। আমি সব বুড়ো মানুষদের মুখের ওপর এই কথাগুলো বলে দিতে পারি। সব নড়বড়ে, পাকা চুলওলা বুড়ো-হুজুরদের মুখের ওপর ; গোটা পৃথিবীর মুখের ওপর। এই কথা বলার অধিকার আছে আমার, কারণ আমি নিজে তো বাঁচব ষাট বছর পর্যন্ত...সত্তর পর্যন্ত...আশি পর্যন্ত...দাঁড়ান, দম নিয়ে নিই...

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, আমি আপনাদের সঙ্গে রগড় করছি! ভুল করছেন। আপনারা যেমন ভাবছেন, বা ভাবতে পারেন, তেমন রগুড়ে লোক আমি একটুও নই। কাজে কাজেই এসব বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে (টের পাচ্ছি, আপনারা বিরক্ত হয়েছেন) হয়তো জানতে চাইবেন, কে আমি। সেক্ষেত্রে আমার উত্তর আমি একজন মাঝারি স্তরের আমলা। একটা কিছু করে খেতে হবে তাই চাকরি করেছি। শুধু ওই একটি কারণে। গত বছর এক দূরাত্মীয় উইল করে আমাকে ছ-হাজার রুবল দিয়ে গেছেন। টাকাটা পাওয়ার সাথে সাথে চাকরি ছেড়ে নিজের গৃহকোণে থিতু হয়ে বসে পড়েছি। আগে এই গৃহকোণে থাকতাম ; এখন থিতু হয়ে বসেছি। আমার বাসা শহরতলিতে। খুবই এবড়োখেবড়ো, বিটকেলে ধরনের। চাকর বলতে আছে এক দেহাতি। নির্বোধ অতিশয়। বেয়াদব। গা থেকে সব সময় দুর্গন্ধ বেরোয়। অনেকে বলেছে, পিটার্সবুর্গের আবহাওয়া আমার ধাতে সইবে না। তা ছাড়া এখানে থাকা আমার মতো সামান্য আয়ের লোকের সামর্থ্যেও কুলোবার কথা নয়। আমি ওইসব ওস্তাদ বুজর্গান উপদেশওলাদের চেয়ে কম বুঝি না। আমি পিটার্সবুর্গে আছি। কিছুতেই পিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাব না! যাব না, কারণ...ধেৎ, যাব কি যাব না তাতে কিছুই যায়-আসে না।

একজন ভালোমানুষ কী বিষয়ে কথা বলে সবচেয়ে খুশি হয় বলুন তো?

নিশ্চয়ই নিজের বিষয়ে।

হুঁ, তা হলে নিজের কথাই বলি।

দুই

ভাই, শুনতে চান বা না চান, আমি বলতে চাই কেন আমি একটি নগণ্য কীট পর্যন্ত হতে পারি নি। চুপি চুপি বলি, অনেকবার কীট হতে চেয়েছি। ভাই, কিরে কেটে বলছি, অতিশয় সচেতন হওয়া কিন্তু এক ধরনের ব্যাধি। একেবারে আগাপাস্তালা ব্যাধি। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সাধারণ মানের মানবিক সচেতনতাই যথেষ্ট। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই নিরানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন সংস্কৃতিবান মানুষের যতটা চেতনার শক্তি আছে তার অর্ধেকটা কিংবা সিকিভাগ থাকলেই কিন্তু

চলে যায় ; বিশেষ করে সেইসব ভাগ্যহত মানুষদের, যাদের এই মহাপৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তববাদী আর স্বার্থপর শহর পিটার্সবুর্গে বাস করতে হয়। (সব শহর নিশ্চয় স্বার্থপর নয়, নিঃস্বার্থ শহরও আছে!) ততটুকু পরিমাণ চেতনা থাকলেই চলে, যেমনটি নিয়ে তথাকথিত সব চটপটে আর করিতকর্মা লোক পৃথিবীতে বেঁচে আছে। নিশ্চয় ভাবছেন, এসব আমার ভান, করিতকর্মা লোকেদের দাক্ষিণ্যে চালাকি করছি ; তার চেয়ে খারাপ কথা, বিজাতীয় ভণ্ডামি থেকে এসব লিখছি। আমার সেই উপরওলাটি যেমন করতেন, তেমনি তরোয়াল নাচাচ্ছি। কিন্তু ভাই, বলুন তো, কে নিজের অসুস্থতা নিয়ে বড়াই করতে পারে?

যদিও মোটের ওপর সবাই তাই করে। নিজেদের অসুখ নিয়ে লোকে গর্ব করে। আমিও করি। তবে হ্যাঁ, আমি একটু বেশি করি। এ-নিয়ে কোনো তর্কে যাচ্ছি না। বিবাদের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অনেক চেতনা—বিশেষ করে সব ধরনের চেতনাই আসলে ব্যাধি। এই প্রত্যয়ে আমি অটল। আচ্ছা, এটাও এক মিনিটের জন্য বাদ দিয়ে রাখা যাক। একটা কথা বলুন তো, কেন আমার এমন হয়? ধরুন একেবারে ঠিক যে-মুহূর্তে আমি সব কল্যাণ আর সুন্দরের সূক্ষ্ম রসগ্রহণে সক্ষম তখনই কোত্থেকে যেন পরিকল্পিতভাবে ছুটে আসে কুৎসিত, অমঙ্গলের হাতছানি। তখন শুধু অনুভবের ব্যাপার নয়, নিয়তি যেন আমাকে তাড়া করে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে—যা করার কথা এমনিতে ভাবতেও পারি না। সত্যম শিবম সুন্দরমের সাধনায় যতই মনোনিবেশ করি, দেখি, ততই ডুবে যাচ্ছি আপন অসুন্দরের গভীর পাঁকের ভিতর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এগুলো যে হঠাৎ করে হয়ে যায়, তা নয়। এ যেন আমার অলঙ্ঘনীয় নিয়তি। এই যেন আমার স্বাভাবিক অবস্থা—এ মেনে না নিয়ে আমার উপায় নেই। এ যেন কোনো অসুখ নয়, মানসিক বিকৃতিও নয়—যার বিরুদ্ধে সব ইচ্ছাশক্তি একত্র করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলাম, এ আমার স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু একেবারে গোড়ায়, মানে শুরুর দিকে যখন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, তখন কী আমাকে সবচেয়ে দুর্ভাবনায় ফেলত জানেন? আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না, সব মানুষেরই এরকম হয়। সারাজীবন বিষয়টি কেবল নিজের সমস্যা মনে করে একান্ত গোপন সম্পদের মতো লুকিয়ে রেখেছি। ভেবে লজ্জা পেয়েছি (এমনকি এখনও হয়তো লজ্জা পাই)। এই নগরীতে কোনো কোনো দুঃখরাতে বাসার নিজস্ব জায়গাটিতে ফিরে এক গোপন, অস্বাভাবিক, জঘন্য আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছি। ভুলতে পারি নি, সেদিন আবার একটি গর্হিত কাজ করেছি। যা করেছি, তা তো আর ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। গভীর গোপনে মনে মনে বিষম যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়েছি, হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি চরম আনন্দ। সত্যিকার, পরম আনন্দ! এ কথা বললাম এ জন্য যে আমি সব সময় জানতে চেষ্টা করি, অন্য মানুষেরাও ওইরকম আনন্দ পায় কি না। একটু বুঝিয়ে বলি। এই আনন্দ আসে মানুষের পতনের তীব্র চেতনা থেকে ; এমন

এক চেতনা থেকে, যখন সে বুঝতে পারে বিনষ্টির শেষ সীমানায় সে পৌঁছে গেছে। সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে তার আর নিস্তার নেই, পালানোর পথ নেই। সে আর নিজেকে বদলাতে পারবে না। এমনকি সময় আর বিশ্বাস যদি যে সুযোগ তাকে দেয় তবু সে নিজের পরিবর্তন চাইবে না বা তার জন্য কিছু করবে না। কারণ বাস্তবে নিজেকে অন্যভাবে গড়ার মতো কিছু খুঁজে পাবে না সে।

তার চেয়ে বিশ্রী এবং গোড়ার ব্যাপার হচ্ছে এর সঙ্গে গভীরভাবে মিলে আছে অতি সূক্ষ্ম চেতনার এক মৌলিক তত্ত্ব। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জড়তা আর তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। সেই হিসেবে মানুষ যে শুধু নিজেকে বদলাতে পারে না তাই নয়, সে কিছু করতেও পারে না। তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াচ্ছে? সেই সূক্ষ্ম চেতনার পরিণতিতে কেউ যদি নির্বোধ হয়, তবে তার জন্যে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। সে স্বভাবত নির্বোধ, তার কিছু করার নেই, এই তার একমাত্র সান্ত্বনা। দূর, অনেক হয়েছে। অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি। ব্যাখ্যা করতে আর পারলাম কই? ব্যাখ্যা করতে পারার মধ্যে মজারই বা কী আছে? কিন্তু তবু আমি বলব, শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলব। সে জন্যই তো কলম হাতে নিয়েছি।

আমার বাতিক আছে অল্পেই মেজাজ খরাপ করার। সন্দেহপ্রবণতায় ভুগি। কুঁজো কিংবা বামন দেখলেও রাগ হয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এমনও সময় আসে, যখন মনে হয়, কেউ যদি আমার গালে কষে চড় লাগাত, বেশ মজা পেতাম। আন্তরিকভাবেই বলি, আমার উচিত ছিল সেই বিশেষ ধরনের আনন্দ—হতাশার আনন্দ খুঁজে বার করা। হতাশার ভিতর আসলে সুগভীর আনন্দ লুকিয়ে আছে, বিশেষ করে এমন এক হতাশ মুহূর্তে, যখন মানুষ তার অবস্থার নৈরাশ্য সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। সেক্ষেত্রে একটা চড় খেয়ে মানুষের কেন যে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে বুঝি না। যার জন্য আমি কোনোভাবেই দায়ী নই, যা কেবলই প্রকৃতির ব্যাপার, তার জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবাটা আমার কাছে রীতিমতো বিব্রতকর। বিশেষভাবে আমি দায়ী কেন? চারপাশের অন্য মানুষদের তুলনায় আমি বেশি বুদ্ধিমান, তাই? (আমারও সব সময় মনে হয়েছে, চারপাশের অন্য মানুষদের তুলনায় আমার বুদ্ধি বেশি। আবার ভেবে লজ্জাও পেয়েছি। হয়তো তাই সারাজীবন আমি সবার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি ; কারুর চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারি নি।) আর বিদ্বেষ যদি আমার মনে থাকে তবে তার যে কোনো মানে হয় না—এই অনুভবও সারাক্ষণ তাড়া করেছে আমাকে। বিদ্বেষ পুষে রাখা ছাড়া অন্য কিছু আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষমা করাও ছিল আমার সাধ্যাতীত। প্রতিপক্ষ আমার গালে চড় মেরেছে—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে। প্রকৃতির নিয়মকে তো আর ক্ষমা করা যায় না, ভোলাও যায় না। সব অপমানের চরিত্রই তো এক ! উলটে কী হয়েছে, বিদ্বেষ এড়াতে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহাই বেড়েছে। মন স্থির করলে অন্য অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু কেন মন স্থির করব আমি? এখন বিশেষভাবে এই বিষয়েই কয়েকটা কথা বলতে চাই।

তিন

সেইসব মানুষের পক্ষে কাজটা কীভাবে সম্ভব যারা জানে কীভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় আর তার পক্ষে সাফাই গাইতে হয়? খুবই সম্ভব। প্রতিহিংসার বাতিকে যখন ধরে তখন বোধ হয় অস্তিত্বে ওই জিনিসটি ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। এইরকম সময় মানুষ খ্যাপা ষাঁড়ের মতো শিং নিচু করে নাক বরাবর ছুটতে থাকে লক্ষ্যের দিকে। দেয়াল ছাড়া অন্য কিছু ওইসময় তাকে আটকাতে পারে না। (প্রসঙ্গত, হঠাৎ সামনে দেয়াল দেখে কিন্তু ওইরকম মানুষেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাদের কাছে দেয়াল গতিবদল কিংবা গতিরোধের অজুহাত নয় ; ওটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করি আমরা—যারা কেবলই ভাবি আর শেষ পর্যন্ত কিছুই করি না। সব আন্তরিকতার ক্ষেত্রেই তারা ওইরকম হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। দেয়াল তাদের খ্যাপামি প্রশমিত করে, সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে দেয়াল হিসেবেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।)

তো...ওইরকম সোজাসাপটা মানুষকেই আমি সত্যিকার সাধারণ মানুষ মনে করি, মা বসুন্ধরা যাকে জন্ম দেবার মুহূর্তে মায়াময় চোখ মেলে দেখতে চেয়েছিল। ওই মানুষকে আমি হিংসা করি—যতক্ষণ না মুখে ঈর্ষা ফুটে ওঠে। সে তো বোকা! এ নিয়ে বিতর্কে যাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ মাত্রই আহাম্মক। কিন্তু এটা বুঝবেন কীভাবে? আসলে সেটাও এক মজার ব্যাপার। আমার মনে আরও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে : সাধারণ লোকের বিপরীতধর্মী মানুষ, মানে যাদের চেতনা সূক্ষ্ম যারা ঠিক মাটির কোলে না জন্মে ল্যাবরেটরির বকযন্ত্রে জন্মেছে (এও এক রহস্য, ভাই, কিন্তু আমার তা-ই বিশ্বাস), সেই ল্যাবরেটরিজাত মানুষ, সূক্ষ্ম চেতনার অবিরাম ভারে ক্লান্ত মানুষ, সাধারণ মানুষদের ভিড়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় ; নিজেকে তার আর মানুষ মনে হয় না, মনে হয় থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো। হয়তো সূক্ষ্ম চেতনাসমৃদ্ধ ইঁদুর ; তবু তো ইঁদুর। আর তার বিপরীতে যে সে মানুষ। মানুষ মানেই ইত্যাদি ইত্যাদি

তার চেয়ে খারাপ অবস্থা তার দাঁড়ায় যখন সে নিজের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে নিজেকে ইঁদুরের জায়গায় দেখে। কেউ তাকে এভাবে দেখতে বলে নি, অথচ তার কাছে সেটাই হয়ে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী করে এই ইঁদুর? দেখবেন? ধরুন, সে বিষম অপমানিত বোধ করল। প্রায় সব সময়ই সে নিজেকে ওইরকম অপমানিত মনে করে।)

সে প্রতিশোধ নিতে চাইল। যাদের আমরা প্রকৃতির সন্তান বলি, কিংবা যারা খাঁটি সত্যনিষ্ঠ মানুষ—তাদের মনে যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণার সঞ্চয় থাকতে পারে তার মধ্যে। তাদের মনে যে গোপন কুৎসিত কামনা লুকিয়ে থাকে, তারচেয়ে বেশি থাকতে পারে সেই ইঁদুরের মনে। প্রতিহিংসার

বেলায় স্বাভাবিক কারণেই মানুষের সমস্যা বেশি ; তাকে ন্যায়বিচার আর স্বাভাবিক বিবেকের কথা মনে রাখতে হয়। কিন্তু ইঁদুর তো আর ন্যায়বিচারের ধারণায় বিশ্বাস করে না। আসল কাজ, মানে প্রতিহিংসা সাধনের কথায় চলে আসি। সেই মৌলিক অশালীনতা ছাড়াও ভাগ্যহত ইঁদুরটি এর চারপাশে গড়ে তোলে সন্দেহ আর সংশয়ের আরও অনেক অশালীনতা। একটি প্রশ্নের সঙ্গে জোড়া দেয় অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন, যা এর চারপাশে অনিবার্যভাবে তৈরি করে একধরনের সর্বনাশা যৌগ। এক পূতিগন্ধময় আবর্জনা। অবিশ্বাস, আবেগ আর ঘৃণার থেকেই এসব আসে। ইঁদুরের অবশ্য একটাই কাজ করার থাকে তখন। তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দেয়া আর ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে গুটি গুটি পায়ে গর্তের ভিতর ঢুকে পড়া—যদিও তাতে তার বিশ্বাস নেই। ভূগর্ভের সেই নোংরা, দুর্গন্ধময় ডেরার ভিতরে আমাদের অপমানিত, বিধ্বস্ত, ইঁদুরের মনে—যার অবস্থা দেখলে হাসি পায়—ক্ষণকালের মধ্যে জন্ম নেয় প্রবল, বিরূপ, বিনিঃশেষ বিদ্বেষ। তারপর চল্লিশ বছর ধরে চলতে থাকে তার আঘাতের স্মৃতিচারণ—তুচ্ছ সব কলঙ্কের বিশদ ঘটনাবলিসুদ্ধ। যত দিন যায় আরও অকিঞ্চিৎকর অপমান আর কলঙ্কগুলোর কথা মনে পড়ে তার। আপন কল্পনাজালে তীব্রতর হয়ে ওঠে আঘাত, মনে মনে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে সে। এইসব কল্পনা করে নিজেই লজ্জা পায় সে, তবু সেসব ব্যাপার না-ভেবে পারে না। ভাবতে ভাবতে এও বুঝতে পারে যে, হয়তো এত সব ঘটনা ঘটত না, তবুও ওই যে...ঘটতে পারত...এই ভেবে রাগটা আরও খানিক বাড়িয়ে নেয়া চলে, আরও খানিক ক্ষমাহীন হওয়া যায়। কিন্তু তাতে কী? প্রতিশোধ নেবার স্পৃহার পেছনে যোগ হয় নানা দুর্ভাবনা : প্রতিশোধ নেবার অধিকার তার আছে কি না, নিয়ে লাভ হবে কি না—এইসব নানা মামুলি প্রশ্ন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ফলে যার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তারচেয়ে শতগুণ জ্বলুনিতে ছারখার হতে হয় তাকে। তারপর একদিন সেই থ্যাঁতা ইঁদুর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে টেবিলের ওপর—মৃত্যুর অপেক্ষায়। তার মনে তখন সুদে-আসলে ফিরে আসে এতগুলো বছরে জমানো সব স্মৃতি, আর

থাক সে-কথা। যে অদ্ভুত আনন্দের কথা বলছিলাম তার আসল প্রমাণ কিন্তু ওই জঘন্য আধা-হতাশায় আধা-আশায় চল্লিশ বছর গুপ্ত বসবাসের ভিতর লুকিয়ে আছে। আসল প্রমাণ লুকিয়ে আছে সেই আত্মহননের ভিতর, যার কিছুটা চেনা যায় আর কিছুটা নিয়ে সংশয় মানুষকে দোলায়িত করে ; যার পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হয় না অথচ একমিনিট পরেই অনুশোচনা শুরু হয়ে যায়। বিষয়টা এত সূক্ষ্ম, ব্যাখ্যা করা এত কঠিন যে, সীমাবদ্ধ বুদ্ধির মানুষেরা কিংবা যাদের নার্ভ খুব শক্ত তাদের পক্ষে এর কণামাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে নিয়ে আপনি নিশ্চয় মুচকি হেসে বলবেন, 'হয়তো যেসব মানুষ গালে চড় খায় নি তারা এসব বুঝবে না।' এর মানে তো সোজা। আমি নিশ্চয় চড় খেয়েছি, তাই বুঝতে পারছি। না, ভাই। যদিও আমার কাছে চড় খাওয়া

আর না-খাওয়ার মধ্যে ইতরবিশেষ নেই তবু জেনে রাখুন, এখনও চড়টড় খেয়ে উঠতে পারি নি। বরং জীবনে চড় কষিয়েছি অনেকের গালে—যার কারণে এখনও অনুশোচনায় ভুগি। কিন্তু ব্যস্, এই পর্যন্তই। আপনাদের যতই আগ্রহ থাক, চড়ের ব্যাপারে আর একটি কথাও নয়।

সেইসব শক্ত নার্ভওলা মানুষদের কথায় ফিরে আসি, যারা আনন্দের সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবগুলোর কথা জানে না। এঁরা যদিও কখনও কখনও সর্বশক্তি দিয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচান, যদিও এতে তাদের বেশ নামডাক হয়, তবু বলব, অসম্ভবের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলেই চিৎপাত হয়ে যান এঁরা। অসম্ভব মানে পাথরের দেয়াল! পাথরের দেয়াল কী? নিশ্চয় প্রকৃতির বিধান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ। গণিত। একটা উদাহরণ দিই। বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করেছে, আপনার পূর্বপুরুষ বানর ছিল, তখন আর ভ্রূ কুঁচকে লাভ নেই। সত্যি বলে মেনে নিন। যখন প্রমাণ পাবেন, শতসহস্র প্রতিবেশীর জীবনের চেয়ে আপনার নিজের একফোঁটা চর্বি আপনার কাছে বেশি প্রিয়, সেইসঙ্গে আরও বুঝবেন, তথাকথিত নানান ধর্ম-কর্তব্য আর সংস্কার-কল্পনার মীমাংসার মধ্যে এইটেই চূড়ান্ত, তখন তো মেনে না-নিয়ে অন্য কিছু করার থাকবে। এক অঙ্কের দু-রকম ফল হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। চেষ্টা করে দেখুন না এর অন্যথা করা যায় কি না।

"বিশ্বাস করুন, তারা চিৎকার করে উঠবে। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। এ হচ্ছে দুই আর দুইয়ে চার-এর হিসেব। প্রকৃতি এ-ব্যাপারে আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করবে না। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার কিছু যায়-আসে না। পছন্দ হোক আর না-ই হোক, প্রকৃতির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে আপনাকে। দেখুন, দেয়াল দেয়ালই ... ... এই হচ্ছে নিয়ম।"

পরম করুণাময়! কিন্তু আমি যখন কারণসঙ্গতভাবেই প্রকৃতির বিধান পছন্দ করি না, তখন ওসব নিয়ম আর অঙ্ক দিয়ে আমার কী হবে? মাথা ঠুকে মরে গেলেও অবশ্য ওই দেয়াল ভাঙতে পারব না, কারণ আমার সে-শক্তি নেই। তাই আমি দেয়াল ভাঙতে যাচ্ছি না।

পাথরের দেয়াল সান্ত্বনা হিসেবে নিতে পারলে মন্দ হত না। এর মধ্যে বিরোধের একটা মীমাংসাও আছে। দুইয়ে দুইয়ে চার-এর মতোই এটা সত্যি। আহা! একেই বলে অসম্ভবের অসম্ভব। এর সবই যদি বোঝা যেত, চেনা যেত, এইসব অসম্ভব আর এইসব দেয়াল আমাদের সমস্যা হত না। সবচেয়ে অবধারিত, অনিবার্য নিয়মে সবচেয়ে কঠিন দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যেত। দেয়াল ভাঙার ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে না-গিয়ে আপনি দিব্যি হাল ছেড়ে দিয়ে বিলাসে ডুবে যেতেন। কিন্তু জানেন তো, সেটি হবার জো নেই। দ্বন্দ্ব মীমাংসার আগে আরও অনেক পথ আছে দেয়াল ভাঙার কষ্ট এড়ানোর। হাত সাফাই, জাল-জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি সব মিলিয়ে ওই পথে আছে অনেক হাঙ্গামা। কিন্তু দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত

কার কিংবা কী সেই দায়িত্ব—না-জানার বেদনার ভার আপনারই। আরও মুশকিলের কথা, আপনি যত দেখবেন কিছুই জানেন না, ততই বেড়ে যাবে আপনার বেদনা।

চার

আপনি চিৎকার করে হেসে উঠবেন। 'হাঃ হাঃ হাঃ   এরপর তো আপনি দাঁতের যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাবেন।'

আমি বলব, 'তা   হ্যাঁ, দাঁতের যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দ আছে।' একমাস দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগে জেনেছি। সেক্ষেত্রে অবশ্য মানুষ নীরবে বেদনা সহ্য করে না ; গোঙায়। গোঙানির মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ আছে। ওই বিদ্বেষপূর্ণ গোঙানির মধ্য দিয়েই মানুষ আনন্দ প্রকাশ করে। আনন্দ না-পেলে সে মুখে কাতরধ্বনি বার করত না। চমৎকার উদাহরণ, তাই না ভাই? বুঝিয়ে বলি। প্রথম দিকটায় ওই গোঙানি আপনার যন্ত্রণার লক্ষ্যহীনতারই ইঙ্গিত দেয়। আপনার চেতনাকে বিব্রত করে। প্রকৃতির গোটা বৈধ নিয়মের প্রতি সেটা আপনার সুনির্দিষ্ট ক্ষোভ। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, দেখুন। যে নিয়মে প্রকৃতি আপনাকে ওই কষ্ট দিচ্ছে, সেই একই নিয়মে প্রকৃতি নিজে কিন্তু নির্বিকার ; তার কিছু যায়-আসে না। অজ্ঞাত শত্রু আপনাকে যন্ত্রণায় জর্জর করছে, অথচ তাকে শাস্তি দিতে পারছেন না। শহরে এত দন্ত-চিকিৎসক, তবু দাঁতের দাসত্ব বরণ করতে হচ্ছে আপনাকে। প্রতিবাদ, চেঁচামেচি, কোনোকিছুতেই কাজ হবে না। বড়জোর দেয়ালে ঘুসি মারতে পারবেন সর্বশক্তিতে। কিন্তু তারপর? ভাগ্য ভালো হলে এমনি সেরে যাবে সব যন্ত্রণা কিংবা তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে। শেষ পরিণতি নিরাময়ে, যা আসলে আনন্দের নামান্তর।

এক কাজ করুন না ভাই! দাঁতের ব্যথায় ছটফট করছে এমন কোনো মানুষের আর্তনাদ শুনুন ঘনিষ্ঠভাবে। দেখবেন, প্রথমদিনের তুলনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয়দিনের গোঙানির ধরন বদলে যাচ্ছে। শেষের দিকে সেটা হয়ে উঠবে নিষ্ফল আক্রোশের হুঙ্কার। কিন্তু যখন আশেপাশের শ্রোতা কিংবা তার বাড়ির লোকজনের কাছে ব্যাপরটা গা-সহা হয়ে উঠবে, তখন দেখবনে, সব চিৎকার আর দাপানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তখনও তার আর্তনাদে আক্রোশ থাকবে—কিন্তু তা কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে আনন্দই তার চরিতার্থতা। তিনি বলতে চাইবেন, 'তোমাদের সবাইকে ভোগাচ্ছি, তোমাদের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাচ্ছি। বাড়িভর্তি মানুষকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছি। থাকুন-না আমার সঙ্গে সারারাত জেগে। আপনিও প্রতিমুহূর্তে টের পাবেন, কী যাতনা দন্তবিষে! কী মনে হচ্ছে আমাকে?

প্রথমদিকে যেমন একটা নায়ক-নায়ক ভাব ছিল সেরকমটা আর পাচ্ছেন আমার মধ্যে? এখন তো আমাকে স্রেফ একটা বাজে, ভুয়া লোক মনে হচ্ছে! তবে তাই হোক। খুশির খবর, আপনি আমার ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন। আমার বিশ্রী, বিকট আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন। হোক বিশ্রী, বিকট। এরপর তো আরও বিশ্রীভাবে কঁকিয়ে উঠতে পারি

এখনও বুঝতে পারছেন না ভাই? তার মানে এইসব অদ্ভুত আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য আমাদের জ্ঞান আর চেতনার আরও একটু উন্নতি দরকার। হাসছেন? খুশি হলাম। আমার রসিকতা নিশ্চয় খুব নিচুমানের, তাই না ভাই? শুনতে হোঁচট লাগে, একটু বেশি গায়ে-পড়া ধাঁচের, আর আত্মবিশ্বাসের অভাব তো বিষম প্রকট। হয়তো এসবের কারণ : নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু সত্যি বলুন তো, কোনো বস্তুনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে কি নিজের ওপর শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব?

পাঁচ

আচ্ছা, বলুন না, যে কিনা নিজের দুরবস্থা অনুভব করার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়, নিজের প্রতি ছিটেফোঁটা সম্মানবোধও কি তার আছে বলে মনে হয়? অনুশোচনার আবেগে খাবি খেতে খেতে এই কথা বলছি না। আর, সত্যি বলছি, "বাবা, মাফ করে দাও, আর কখনও এমনটি করব না" জাতীয় বাক্য আওড়ানোর কথা আমি কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এইজন্য নয় যে, ওই কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ; বরং সত্যি বলতে কি, একটু বেশি সক্ষম—তা সে যে-উপায়েই হোক! অন্তত যেসব ক্ষেত্রে আমার দোষ নেই সেসব ক্ষেত্রে ঝামেলায় পড়ে গেলে জিদটা বেশি হয়ে ওঠে। সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার। একই সঙ্গে এসব ঘটনায় আমি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি, সত্যিকার অনুশোচনায় ভুগি আর আমার চোখে পানি এসে যায়। কিছুটা আত্মপ্রতারণার আশ্রয়ও এ সময় আমাকে নিতে হয়, যদিও জানি, অভিনয়টা আমাকে দিয়ে হয় না।

প্রকৃতির বিধানের ওপর দোষ চাপিয়েই বা কী লাভ? সারাজীবন ওই প্রকৃতির বিধানই আমাকে সবচেয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু তারপর তো আবার সব মিথ্যে মনে হয়েছে। মিথ্যে আবেগ, মিথ্যে অঙ্গীকার। জিজ্ঞেস করতে পারেন, এইসব আগডুম বাগডুম নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি কেন? উত্তর : হাত গুটিয়ে বসে থাকা যেই খামোকা মনে হয়েছে, অমনি তার শুরু হয়েছে তিড়িং বিড়িং নাচ। সত্যি তাই। নিজের দিকে ভালো করে লক্ষ করুন, বুঝতে পারবেন। আমি বারে বারে জীবনটাকে অভিযান দিয়ে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি, নইলে বাঁচা যাবে কী দিয়ে। জীবনে কতবার যে এমন ঘটল—খামোকা কতকগুলো কারণে মেজাজ

বিগড়ে গেল। জীবনভর ফন্দি আঁটলাম, এমন কায়দা করে অ্যাডভেঞ্চার সাজাব যেন শেষটা নিজেই আর সামলাতে না পারি। আর একবার ... একবার নয়, আসলে দুবার, জোর চেষ্টা করেছি প্রেমে পড়তে। সত্যি বলছি ভাই, বিশ্বাস করুন, দুবারই বিস্তর ভুগেছি। হৃদয়ের গভীরে সেই দুর্ভোগের পিছনে কোনো বিশ্বাস ছিল না ; ছিল মৃদু পরিহাসের চাঞ্চল্য। তারপরও ভুগতে হয়েছে আমাকে ; সেই সনাতন ধরনে। কিছুই করার ছিল না। জানি না কার ওপর প্রচণ্ড ঈর্ষা হত, অভিমান হত। শেষে বুঝলাম, এর আসল কারণ কী। অবসাদ, ভাই, মানসিক অবসাদ। জড়তা আমাকে গ্রাস করেছিল। জানেন তো, সচেতনতার প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে জড়তা। মানে হাত গুটিয়ে সচেতনভাবে বসে থাকা আর কি! আবার বলছি, আবার জোর দিয়ে বলছি, সব 'কর্মবীর' কিংবা করিতকর্মা মানুষ সব সময় কাজে ডুবে থাকে, কারণ তারা নির্বোধ। বুঝিয়ে বলি। যাদের ধীশক্তি সীমিত তারা খুব দূরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না ; যে-সমস্যা ঠিক কাঁধের ওপর এসে পড়েছে, সেটা সামাল দেয়াই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ফলে তাদের সদাব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই। কোনো কাজে রত হবার শুরুতে কী হয় আপনার? মনটা সহজ-সচল করে নেবার দরকার হয়, এতে কি সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে? উদাহরণ হিসেবে আমার কথাই ধরুন না। কীভাবে মনটা থিতু করি? যা করতে যাচ্ছি, তার মূল কারণ কী? আমার দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়? সেখান থেকে আমি কী পেতে পারি? এইসব প্রশ্ন নিয়ে আমার মনের মধ্যে একটির পর একটি প্রশ্নোত্তর চলে—শেষ পর্যন্ত তা অসীমের দিকে গড়ায়। এই হচ্ছে সব সচেতনতা আর মানসিকতার মূল রহস্য। ঘুরেফিরে এই হয়তো প্রকৃতির বিধান। কিন্তু এর পরিণাম কী? সেই একই পরিণতি। মনে করে দেখুন, একটু আগেই প্রতিহিংসার কথা বলেছি। (ভালোই জানি, মেনে নেন নি।) বলেছি, মানুষ যে প্রতিশোধ নিতে চায় তার আসল কারণ প্রতিশোধের মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পায়। ন্যায়বিচারের আনন্দ। তিলে তিলে প্রতিহিংসার পথে সে এগিয়ে যায় সেই ন্যায়সঙ্গত আনন্দের অন্বেষণে। কিন্তু আমি তো এর ভিতরে কোনো ন্যায়বিচার খুঁজে পাই না। তাই আমি যখন প্রতিশোধের জন্য ছুটব—তার পেছনে বিদ্বেষ ছাড়া কিছু থাকবে না। কিন্তু সেখানে বিদ্বেষও যদি না থাকে, তখন আমি কিসের পিছনে ছুটব? চেতনার বিধান যে-অভিশপ্ত পরিণতির দিকে আমাকে তাড়িয়ে নেয় তার হাত থেকে আমার মুক্তি কিসে? রাগ আর দ্বেষ সবকিছুর একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, ফলে আসল উদ্দেশ্য কিংবা কার্যকারণ—সব উবে যায়। তখন আর আমরা অপরাধীকে ধরার জন্য ছুটি না ; অন্যায় তখন আর অন্যায় থাকে না। সে তখন কেবল এক না-দেখা ভূতের রূপ ধারণ করে। অনেকটা দাঁতের ব্যথার মতোই দাঁড়ায় ব্যাপারটা। কাউকে আর দোষ দেয়া যায় না। তখন সাধ্যমতো শক্তিতে দেয়ালে ঘুসি লাগানো ছাড়া আর কী করার থাকে? তখন আপনি হাত গুটিয়ে ঝামেলা থেকে সরে আসেন, কারণ মৌলিক কোনো কারণ খুঁজে পান নি। তখন

আপনি ভেসে যেতে চেষ্টা করেন অনুভব নিয়ে—অন্ধের মতো, কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াই, কোনো কার্যকারণ ব্যতিরেকেই। অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য সচেতনতাকে মন থেকে তাড়িয়ে দেন—ভালোবাসায় বা ঘৃণায়। পরে আবার জেনেশুনে আত্মপ্রতারণার জন্য নিজের ওপর খুব রাগও হয়। ফলাফল সাবানের ফেনার বুদ্বুদ আর জড়তা।

হায় রে ভাই, নিজেকে আমার খুব বুদ্ধিমান মনে হয়, জানেন? কারণ সারাজীবন আমি না-পেরেছি কিছু শুরু করতে, না শেষ করতে। ধরে নিয়েছি আমি একজন মানুষ—যার কাজ শুধু কথার ফানুস ওড়ানো। হয়তো বিরক্তির উদ্রেক করি, কিন্তু কারুর কোনো ক্ষতি তো করি না। আসলে আমাদের চারপাশের প্রায় সবাই ওইরকম। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে সব বুদ্ধিমান মানুষের প্রত্যক্ষ এবং একমাত্র পেশা হচ্ছে কথার ফানুস ওড়ানো, তখন কী করার থাকে?

ছয়

জীবনে যদি কিছু করতে না পেরে থাকি তো তার জন্য দায়ী আমার আলসেমি। তা হলে নিজেকে শ্রদ্ধা করব কীভাবে? একটাই কারণে নিজেকে কিছুটা শ্রদ্ধা হয়তো তবু করা যায়, তা হচ্ছে, অন্তত অলস হতে পেরেছি তো! নিজের ওপর আস্থা রাখার মতো এই একটাই ভালো গুণ আছে আমার। প্রশ্ন সেটি কী? উত্তর আলসেমি। কারুর সম্পর্কে এই কথাটি শুনতে কী যে মিষ্টি! এর মানে আমাকে সঠিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা হয়েছে, আমার সম্পর্কে অন্তত কিছু একটা বলার আছে। অলস! আরে, এটা তো অবশ্যই একটা গালি। একটা পেশা। উন্নতির একটা ধারা। হাসবেন না, সত্যি বলছি। এর মধ্য দিয়ে আমি সেরা ক্লাবের সদস্য হতে পারি আর উপযুক্ত পেশা বাছাই করে তিলে-তিলে আত্মসম্মান গড়ে তুলতে পারি। এক ভদ্রলোককে চিনতাম। তিনি সারাজীবন লাফিতির বোদ্ধা সমালোচক হিসেবেই গর্ববোধ করেছেন। ভেবেছেন, ওই তাঁর একটা বিশেষ গুণ। নিজের এই যোগ্যতার ব্যাপারে যাতে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। যে চেতনা নিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন তা শুধু গভীরই ছিল না, একইসঙ্গে ছিল আগ্রাসী। তাঁর কোনো ভুল হয় নি। আমার উচিত ছিল একটা পেশা বেছে নেয়া। উচিত ছিল ভোজনরসিক আর আলসে হওয়া। বিশেষ করে হওয়া উচিত ছিল এমন স্বভাবের মানুষ যার সব শুভ আর সুন্দর জিনিসের প্রতি আছে অদম্য আগ্রহ। কেমন হত? আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা ভাবছি। চল্লিশ বছরে পা দিলে এইসব জিনিস ব্যাপকভাবে মনে ভেতর ভেতর দেখা দিতে থাকে। চল্লিশ একটা বিশেষ বয়স। এই বয়সে মানুষ শুভ আর সুন্দরের প্রতি বিষম দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া

মাধুরী গ্রহণ করার কোনো সুযোগ হারাতে চাই নি আমি। তাই যদি হত তবে আমার জীবনের সবকিছু শুভ আর সুন্দরে ভরে উঠত। যে-কোনো সুন্দর ছবি দেখে আমার চোখ তাহলে ভেজা স্পঞ্জের মতো টপ্‌টপ্ করে অশ্রুপাত করত। কারণ আমি তো শুভ আর সুন্দরের অনন্ত পিয়াসী। সব শুভ আর সুন্দরকে আমি ভালোবাসি।

আমি তাই শ্রদ্ধার দাবিদার। যে আমাকে শ্রদ্ধা করবে না, তাকে ভোগাব। আমি সরল জীবন যাপন করব। সম্ভ্রমের সঙ্গে মরব। সে মৃত্যু হবে পরম রমণীয়। চমৎকার গোল একটা ভুঁড়ি গজাবে। খাঁজ-কাটা চিবুক আর টিকালো নাক থাকবে মুখে। লোকে বলবে, 'দেখ, কী দারুণ লোকটা! খাঁটি, আসল মানুষ!' আরও অনেক কিছু বলতে পারেন আমার সম্পর্কে। ভাটির বয়সে এমন প্রশংসা পাওয়া কি চারটিখানি কথা?

সাত

কিন্তু এ তো কেবলই সোনালি স্বপ্ন। আচ্ছা, বলুন তো, কে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, মানুষ স্বার্থ বোঝে না বলেই সে অপকর্ম করে? ঘোষণা করেছিলেন, মানুষ যদি আলোকপ্রাপ্ত হত, স্বাভাবিক আর সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে যদি তার চোখ খোলা থাকত তবে কিছুতেই খারাপ কাজ করতে পারত না। সে ভালো হয়ে যেত, সৎ হয়ে যেত। কারণ আলোকিত আর বোধসম্পন্ন হওয়ার মধ্যেই তো তার আসল সুবিধা। অন্য কিছুর ধান্দা না করে শুধু ভালো হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সে স্বার্থ খুঁজে নিতে পারত। আমরা তো সবাই জানি, কোনো মানুষ জেনেশুনে তার স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করে না। কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে, প্রয়োজনের তাগিদেই তাকে ভালো হতে হয়। হায় অবোধ শিশু! নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশু! আচ্ছা, অতীতের কথাই ধরুন না। হাজার হাজার বছরের মধ্যে এমন কোনো সময়ের কথা কি বলতে পারবেন যখন মানুষ স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছে? কখনও মানুষ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথে পা বাড়িয়েছে? কখনও কি সে স্বার্থ উদ্ধারের সরল-সহজ পথ ছেড়ে জেনেশুনে একগুঁয়ের মতো বিপদসঙ্কুল ঝুঁকিবহুল পথ ধরে অজানা অন্ধকারে বিলীন হতে চেয়েছে? যদি সে ওইরকম বেপথু হয়ে থাকে তার পেছনে নিশ্চয় কারণ ছিল ; ছিল বৃহত্তর সুবিধার ইশারা। সুবিধা! আচ্ছা, সুবিধা কী? সঠিক, নির্ভুল সংজ্ঞা দিতে পারবেন মানুষের সুবিধার? অনেক সময় সে অবশ্য ক্ষতিকর বেপথটাই বেছে নিয়েছে—কিন্তু সে তো তার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটাই তার সুবিধা! এরকম ক্ষেত্রে সে তার নীতি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। কী মনে হয়? শুধু আকাঙ্ক্ষার খাতিরে এতবড় ঝুঁকি নেবে সে? হাসছেন।

তা হাসুন, ভাই। কিন্তু এই প্রশ্নটির উত্তর দিন। মানুষের সুবিধার ব্যাপারটি কি সব সময় সুনির্দিষ্ট সুনিশ্চিত পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? দেখুন, ভাই, আমি বেশ ভালোভাবেই জানি, আপনারা মানুষের সুবিধার হিসেব কষবেন পরিসংখ্যান ছক আর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফরমুলার বেঁধে দেয়া গড় থেকে। আপনাদের সুবিধা মানে উন্নতি-সম্পদ-স্বাধীনতা-শান্তি এমনি সব জিনিস। যে মানুষ এইসবের বিরুদ্ধে যাবে সে যেন বাতিকগ্রস্ত পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। তাই না? কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারটি কী, জানেন? এইসব মানবতাপ্রেমী পরিসংখ্যানবিদগণ কিন্তু মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার বিষয়টি তাঁদের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখেন। বোধ হয় তার কারণ : সেটা কোনো বিশেষ শ্রেণীভাগের আওতায় পড়ে না। একটা উদারহণ দিই। আমার এক বন্ধু আছে ওহো, সে তো, ভাই, আপনাদেরও বন্ধু। বলা চলে, এমন কেউ নেই যে তার বন্ধু নয়। কোনো কাজ শুরু করার আগে সে অবশ্যই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবে—সবিস্তারে, সাড়ম্বরে—যাতে বিশ্বাস আর কার্যকারণের সব বিধান ঠিক রেখে কাজটা সে শেষ করতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা, সে গভীর আবেগে-উত্তেজনায় মানুষের নানান সত্যিকার স্বাভাবিক স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে নিজেদের ভালোমন্দ সম্পর্কে যারা 'কিস্‌সু বোঝে না'—সেইসব অদূরদর্শী নির্বোধ মানুষদের নিয়ে পরিহাস-তারল্যে অনেক গালমন্দ করবে, তারপর ঠিক পনের মিনিটের মধ্যে কোনো কারণ ছাড়া, বাইরের কারুর প্ররোচনা বাদেই, স্রেফ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় অন্য রাস্তা ধরবে। কার্যকারণ, যুক্তি কিংবা মূল স্বার্থ—কোনোটাই আর তার বিবেচনায় থাকবে না।
সাবধান করে দিচ্ছি, বন্ধুটি কিন্তু জটিল ব্যক্তিত্বের মানুষ এবং এ কারণেই একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে দোষী করা যায় না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে : সুবিধার মধ্যে আবার একটা বিশেষ সুবিধার ব্যাপার আছে—যার জন্য মানুষ শত যুক্তি-মর্যাদাবোধ-শান্তি- উন্নতি— এইসব অত্যাবশ্যক বিষয় উপেক্ষা করেও সুবিধার বিরুদ্ধে চলে যায়। সেইটেই তার আসল সুবিধা এবং স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে কাম্য। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, যে-কোনোভাবেই হোক, সুবিধা হলেই তো হয়। না ভাই, আমাকে মাফ করবেন। বিষয়টা একটু খোলামেলাভাবে বলতে চাই। খামোকা কথার বাহাদুরির কিছু নেই এখানে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে : এই যে বিশেষ সুবিধার কথা বললাম, এটা কিন্তু আমাদের সব সুশৃঙ্খল জীবনবোধের বিরুদ্ধে আঘাত ; এটা তিলে তিলে ভেঙেচুরে তচনচ করে দিচ্ছে সমস্ত নিয়ম—মানবতার কল্যাণের জন্য মানবপ্রেমীরা যা তৈরি করেছেন সবকিছু। কিন্তু সেই সুবিধার কথা বলার আগে নিজের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আরও কিছু আপসরফায় আসতে চাই। তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, মানুষকে সৎ আর ভালো হবার তাগিদ দিয়ে তার স্বার্থ সম্পর্কে এত যে ব্যাখ্যা—এসব যুক্তিবিদ্যার অনুশীলন ছাড়া আর কিছু নয়! সত্যি বলছি, সবই নিছক ন্যায়শাস্ত্রের বুলি! নিজের সুবিধা আর স্বার্থের পেছনে বংশপরম্পরায় মানুষের এই যে দৌড়—আমার

বুদ্ধিতে এর আসল কারণ বার্কলের ভাষ্য অনুযায়ী সেই বাস্তব ব্যাপারটা— যার মূল কথা হচ্ছে সভ্যতা বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের মন ক্রমেই নরম হয়েছে, রক্তভৃষ্ণা কমেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ধীরে ধীরে মানুষ যুদ্ধের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। শাস্ত্রমতে মনে হতে পারে এটা তার যুক্তিরই ফসল। কিন্তু দেখুন, বিধিবিধানের ওপর মানুষের একটা স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে ; সে তার যুক্তিতে স্থির থাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে বিকৃত করতে, এমনকি, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে প্রস্তুত। এই উদাহরণ দিচ্ছি এইজন্য যে, এসব ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ। নিজের চারদিকে তাকালেই বুঝবেন। ঝরনাধারার মতো রক্তপাত হচ্ছে—কিন্তু সে এমন উল্লাসের সঙ্গে, যেন রক্ত নয়, শ্যাম্পেনের ছড়াছড়ি। পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা ধরুন—যে সময়টা ছিল বার্কলের জীবনকাল। ধরুন না সবকালের মহানায়ক নেপোলিয়নের কথা। উত্তর আমেরিকার অবিনশ্বর ইউনিয়নের কথা বিবেচনা করুন। কিংবা ধরতে পারেন শ্লেসবিগ-হোলস্টেইনের কথা সভ্যতা আমাদের মধ্যে যে কত রকমের নমনীয়তার সূচনা করেছে, বুঝতে পারবেন। আমার তো মনে হয়, মানুষের মধ্যে নানান রকমের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতার জন্ম দেয়াই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান। এর বেশি কিছুই নয়। এইসব অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিশীলতা থেকেই সে এক সময় রক্তপাতের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। সত্যি বলতে কি, এমনটাই তো ঘটেছে। কখনও লক্ষ করেছেন, সবচেয়ে সভ্য মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে কুশলী নরঘাতকদের দেখা মেলে! এদের কাছে অ্যাটিলা কিংবা স্তেঙ্কা রাৎসিন কিছুই না। কিন্তু তবু অ্যাটিলা কিংবা স্তেঙ্কা রাৎসিনের তুলনায় এইসব ঘাতকদের যদি নিষ্প্রভ মনে হয় তো তার কারণ এই যে, এদের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দেখা হয়, এরা অতি সাধারণ আর খুবই চেনাশোনা। আর মোটের ওপর সভ্যতা যদি মানুষের রক্তভৃষ্ণা নাও বাড়িয়ে থাকে, অন্তত সেই রক্তভৃষ্ণা আরও কুৎসিত, আরও দুঃসহ করেছে—এতে সন্দেহ নেই। প্রাচীনকালে মানুষ রক্তপাতের ভিতরেই ন্যায়বিচার খুঁজে পেত ; সচেতনভাবে যাকে প্রয়োজন মনে করত, খুন করে ফেলত। এখন আমরা মনে করি নরহত্যা অতি জঘন্য জিনিস, তারপরও সেই জঘন্য জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি—আগের চেয়ে আরও বেশি তেজে। কোন্‌টা বেশি খারাপ? নিজেই বিবেচনা করুন। লোকে বলে, ক্লিওপ্যাট্রার (মাফ করবেন, রোমান পুরাকাহিনী থেকে উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে) একটা প্রিয় খেলা ছিল ক্রীতদাসী মেয়েদের স্তনে সোনার পিন ফুটিয়ে তাদের আর্তচিৎকার শুনে মজা পাওয়া। বলতে পারেন, সে তো বর্বর যুগের ব্যাপার। কিন্তু আমার কথা হল বর্বর যুগ তো এখনও চলছে। এখনও কোথাও কোথাও কোনো-না-কোনোভাবে পিন ফোটানো হয়। বর্বর যুগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হলে কী হয়? এখনও বিজ্ঞান আর যুক্তিবোধ তাকে যেভাবে চলতে শেখায়, সেভাবে সে চলে না। তবু আপনি বিশ্বাস করেন, মানুষ নিশ্চয় একদিন তার সব প্রাচীন বদ-অভ্যেস থেকে মুক্তি পাবে নিশ্চয়ই সে

বিজ্ঞান আর যুক্তিবোধ দ্বারাই পরিচালিত হবে। আপনি এই আস্থা পোষণ করেন যে, সে তার ইচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো পরিহার করতে শিখবে ; এবং এইভাবে তার সমষ্টির স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু না-করতে বাধ্য হবে। তারপরও বিজ্ঞান মানুষকে শেখাবে (আমার মতে এটা বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়) সে কখনই সত্যি সত্যি নিজের খেয়ালখুশিমাফিক কিছু করতে পারে নি ; সে আসলে প্রকৃতির খেয়ালখুশির দাস ; প্রকৃতির নিয়মেই তাকে চলতে হয়েছে। তখন বাধ্য হয়েই আমাদের আবিষ্কার করতে হয়েছে প্রকৃতির নিয়মকানুন। ছকে ফেলে হিসেব করা হয়েছে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ, সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে যে, পৃথিবীতে আরও অনেক বড় ঘটনা আর অভিযান বাকি আছে।

তো... এর বেশি আর কী বলবেন? সব প্রশ্নের উত্তর তো আপনাদের হাতের কাছে তৈরি আছে। বলবেন, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো তৈরি হবে, যাতে চোখের পলকে সব প্রশ্ন হাওয়া হয়ে যাবে। তখন গড়ে উঠবে আধুনিকতা আর সমৃদ্ধির সাতমহলা প্রাসাদ। তখন একেবারে সুদিন এসে যাবে। অবশ্য (আমার মতে) এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, সে সময়টা সত্যি খুব খারাপ যাবে। (কারণ সবই যখন ছকে-বাঁধা, হিসেব-কষা, তখন মানুষের তো আর করার বিশেষ কিছু থাকবে না।) কিন্তু অন্যদিকে তখন সবই হবে বাড়াবাড়ি রকমের যুক্তিনির্ভর। সেক্ষেত্রে একঘেয়েমি লাগা অসম্ভব নয়—যার পরিণতি ভালো নাও হতে পারে। তারচেয়ে যা দুর্ভাবনার কথা, (এবারও আমার মতে) মানুষ সমস্যা খুঁজে বেড়াবে, সমস্যা পেলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। মানুষ আসলে বোকা। হয় সত্যি বোকা, না হয় এমন অকৃতজ্ঞ যে পৃথিবী তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা উপমা দিয়ে বলি। একটুও অবাক হব না যদি হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে এক ধোপদুরস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের মানুষ নেমে আসেন আর কোমরে হাত রেখে মহা-রসিক ঢঙে আমাদের সবাইকে বলেন, 'এই যে ভাই, কী মনে হচ্ছে? এর চেয়ে যুক্তিবাদ-ফুক্তিবাদ উড়িয়ে এইসব ছক-তালিকা চুলোর মুখে ঠেলে দিয়ে আগের মতো বোকাসোকা হয়ে নিজের খুশিমতো দিন কাটানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয় না?' তাতে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু অসুবিধা এই যে, তাকেও সাঙাৎ খুঁজে বেড়াতে হবে। অমনি-অমনি কিছু হবে না। এই হচ্ছে মানব চরিত্র। আর তার চেয়েও একটা বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সবকালে সবখানে মানুষ—সে যে-ই হোক— নিজের খেয়ালখুশিমতোই চলতে চেয়েছে। তার যুক্তিবোধ আর সুবিধার কোনো খবরদারি সে বরদাশত করে নি। তাছাড়া স্বার্থের বিরুদ্ধে চলাটাও কেউ বেছে নিতে পারে এবং (আমার মনে হয়) কোনো-কোনো সময় সে অবশ্যই তাই নিয়েছে। সেই খামখেয়ালি, সেই স্বেচ্ছাচারিতাই তার কাছে সবচেয়ে সুবিধাজনক ব্যাপার—এই দিকটা আমরা আসলে লক্ষ করি নি। কোনো তত্ত্ব, কোনো নিয়মের শ্রেণীতে একে ফেলা যায় না।

মূর্খ পণ্ডিতম্মন্যের পক্ষে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা আসলেই বেশ দুরূহ যে, মানুষ স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে একটি স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তি রচনা করতে পারে। কে তাকে ওঁদের যুক্তিবোধ অনুযায়ী জীবনপদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য করবে? মানুষ তো আসলে চায় 'পছন্দের অবাধ স্বাধীনতা।' সে স্বাধীনতার মূল্য আর পরিণতি নিয়ে মাথা ঘামাতে তার বয়েই গেছে। আর সত্যি সত্যি কেউ কি জানে পছন্দ জিনিসটা কী?

আট

আপনি চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে বাধা দিয়ে বলবেন, 'হা হা হা! বাস্তবে কিন্তু পছন্দ বলে কিছু নেই, যা-ই বলুন। বিজ্ঞান এতদিনে মানুষের যেসব গূঢ় বিষয় বিশ্লেষণ করতে পেরেছে, তা থেকে দেখা যায়, পছন্দ বা ইচ্ছের স্বাধীনতা আসলে ...'

দাঁড়ান, ভাই, আমিও শুরুতে তা-ই বলতে চেষ্টা করেছি। স্বীকার করছি, খানিকটা ভয় পেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছি, পছন্দের বিষয়টা অন্য অনেক পূর্বশর্তের ওপর নির্ভর করে, তা ছাড়া পছন্দ দোষের কিছু নয়। কিন্তু যখনই বিজ্ঞানের শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল অমনি গুটিয়ে নিতে হল নিজেকে। আপনি আবার ওই জায়গা থেকেই শুরু করেছেন। যদি কখনও এমন ফরমুলা আবিষ্কৃত হয় যাতে আমাদের সব খেয়ালখুশি আর পছন্দাপছন্দের একটা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, পছন্দের উৎস আর সূত্র কী, কীভাবে তা বিকশিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তার পরিণতিই বা কী, ইত্যাদি সব জানা যাবে নিখাদ গাণিতিক সূত্রে, তখন হবে কী, মানুষের আকাঙ্ক্ষার অনুভবই নষ্ট হয়ে যাবে। সে তো সবকিছু ঠিকঠাক জেনে ফেলছে তখন। নিয়মের নিষ্ঠুর নিগড়ে কে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে? তা ছাড়া তখন সে ঠিক মানুষ থাকবে না; যন্ত্র জাতীয় কিছু একটা হয়ে যাবে। আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন ইচ্ছা আর পছন্দ ছাড়া মানুষ স্রেফ যন্ত্র। আপনার কী মনে হয়? আসুন গোটা বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখি।

'হুম্‌!' আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন। 'সচরাচর আমাদের সুবিধাগুলোকেই পছন্দ বলে আমরা ভুল করি। অনেক সময় সুবিধা হবে ভেবে নিয়ে বোকার মতো আমরা ফালতু জিনিস পছন্দ করি। কিন্তু যখন সব বিশ্লেষণ করা হয়, কাগজের ওপর হিসেব কষে দেখা হয়, তখন সেই সাধ-আহ্লাদ আর থাকে না। কারণ সাধ যখন যুক্তির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, আমরা তখন অবশ্যই সাধ আঁকড়ে না ধরে যুক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ করি। আর যেহেতু সব পছন্দ আর যুক্তির হিসেব সত্যি সত্যিই সম্ভব, তাই এমন দিন আসতে পারে যখন আমরা এমন নিয়ম আবিষ্কার করতে পারব—যা দিয়ে মস্ত ছক কেটে সমন্বয় করতে পারব যুক্তি আর

আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তখন আমি ত্রিশ বছর আগেই ভবিষ্যৎ জীবনের হিসেব করে নিতে পারব। আর তাই যদি হয়, তবে আমাদের করার মতো কিছুই থাকবে না এবং সেটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। তখন তো আমাদের বারবার সাবধান হবার পালা। সাধ আর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয়টাই তখন প্রথম ও প্রধান বিবেচনার বিষয় হবে। কারণ আমার খেয়ালখুশিমতো তাকে তো আর ব্যবহার করতে পারব না। যা-কিছু সিদ্ধান্ত করার, সব আগেই হয়ে যাবে হিসেবমতো, ঠিক ল্যাবরেটরির পরীক্ষাপাত্রে যেমন হয়।'

তা হয়, কিন্তু এইখানে একটু বিরতি দিতে হচ্ছে, ভাই। একটু বেশি দর্শন কপচাচ্ছি, মাফ করবেন। চল্লিশ বছর গুপ্ত জীবন যাপনের ফল এই। আমাকে স্বপ্ন চরিতার্থ করতে দিন। দেখুন ভাই, যুক্তি ভালো। এ-নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু যুক্তি তো যুক্তির বেশি কিছু নয় ; মানুষের প্রকৃতির যৌক্তিক দিকটাই কেবল তা মেটাতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা জুড়ে আছে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র—মানে বাস্তবতা আর আবেগ নিয়ে যে জীবন, তার সবখানে। এই বিচারে আমাদের জীবন যতই অসার্থক হোক, যতই তুচ্ছ হোক, শেষ পর্যন্ত এই হচ্ছে আমাদের জীবন। এ-জীবন শুধু বর্গমূলের অঙ্ক নয়। আমি এই জীবন যাপন করতে চাই ; জীবনের সব বাস্তব আর আবেগসর্বস্ব চাহিদা মিটিয়েই বাঁচতে চাই। বাস্তবতার আওতা কতটুকু? বাস্তব শুধু খেলা করে তার জানার ক্ষমতা আর সাফল্য নিয়ে। যদিও সবকিছু জেনে ওঠা কোনোদিন তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তবু। কিন্তু সে কথা অকপটে স্বীকার করতেও কি তার এত অসুবিধা? মানুষের চরিত্র জীবনের সবটুকু নিয়েই; চেতনা বা অবচেতনে ; যদি ভুল হয়ে যায়, তবু। আমার তো ভাই ভয় হচ্ছে, আপনি করুণার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার বলতে চেষ্টা করছেন যে আলোকপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ মানুষ—অন্তত ভবিষ্যতে মানুষ যেমনটি হবে বলে আমরা ভাবি—কখনও সজ্ঞানে এমন অসুবিধা চাইতে পারে না যা গণিতের নিয়মে অসুবিধা হিসেবে প্রমাণিত। কিন্তু শতবার বলেছি, আবার বলছি, মাত্র একটি ক্ষেত্রে মানুষ জেনেশুনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসুবিধা বেছে নেয়। কেন নেয়? শুধু এই প্রমাণ করার জন্য যে, জীবনের জন্য অসুবিধা বেছে নেবারও স্বাধীনতা আছে তার—হোক না উদ্ভট, হোক না ক্ষতিকর। সে কেবলমাত্র যুক্তিসঙ্গত দিকগুলো বেছে নিতে বাধ্য নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই অসুবিধাই তার জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা হতে পারে ; হতে পারে সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই স্বাধীনতাই আসলে আমাদের ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ। মানুষের কাছে এই বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি হতে পারে। তার পছন্দ সুনির্বাচিত উপায়েই যুক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে হতে পারে, বিশেষ করে সে যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে বিবেচনা-সীমার মধ্যে রাখে। এটাই লাভজনক ; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এটাই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রায়ই দেখা যায়, পছন্দের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ খুবই তীব্র। আর আর সত্যি ব্যাপারটা কী

জানেন? সেটাও আবার একদিক থেকে লাভজনক, এবং বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশংসা পাবার যোগ্য। আচ্ছা ভাই, ধরে নিন, মানুষ বেকুব নয়। (কেউ কেউ নিশ্চয় কথাটা ধরে নিতে রাজি হবেন না, এইজন্য যে মানুষ যদি বেকুব হয় তবে জ্ঞানী কে?) কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি বেকুব না হয় সে সাংঘাতিক রকমের অকৃতজ্ঞ! সুনির্দিষ্ট পরিণতি অনুসারেই অকৃতজ্ঞ। আসলে আমার তো মনে হয় মানুষ হচ্ছে অকৃতজ্ঞ দ্বিপদ প্রাণী। এখানেই শেষ নয়। এটাই তার সবচেয়ে বড় দোষ নয়। তার সবচেয়ে বড় দোষ নিরন্তর নৈতিক স্খলন। মানুষের ইতিহাস ঘেঁটে পরীক্ষা করে দেখুন। কী দেখবেন? মনোহর কোনো দৃশ্য? চাইলে বলতে পারেন মনোহর। একটা উদাহরণ দিই। রোড্‌স্ দ্বীপের কলোসাস মূর্তির কথাই ধরুন। কী অসাধারণ এক সৃষ্টি, তাই না? যুক্তিসঙ্গত কারণেই বিশিষ্ট লেখক আনায়েভস্কি মূর্তিটির নির্মাতা সম্পর্কে দু-রকম ধারণার উল্লেখ করেছেন। একদল যেমন বিশ্বাস করে, মূর্তিটি মানুষের হাতে তৈরি, তেমনি এমন ধারণাও কারুর কারুর আছে যে সেটা প্রকৃতির দান। মূর্তিটি কি বহুবর্ণ? হতে পারে। সব মানুষ যদি সৈন্য কিংবা বিশেষ-বিশেষ কারখানার শ্রমিকের মতো ইউনিফর্ম পরে, দেখতে চমৎকার লাগবে। কিন্তু পোশাক ছাড়াও তো ইউনিফর্মের একটা শোভা আছে, তাই না? একঘেয়ে লাগবে? হয়তো লাগবে। জীবনভর লড়াই করে যাবার মধ্যেও একঘেয়েমি আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এইরকম যে, যে-কেউ পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে যা-হোক একটা কিছু বলতে পারবে—হোক না তার বেশির ভাগটা মনগড়া। একটা কথা কিন্তু কখনই বলতে পারবে না যে সেগুলো যুক্তিগ্রাহ্য। বলতে গেলে গলায় আটকে যাবে কথাটা। বিশ্রী ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই বিষয়গুলোই জীবনে বারবার ফিরে আসছে—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নৈতিকতা আর ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন ; ঘৃণা আর ভালোবাসার প্রশ্ন। নৈতিকতা আর যুক্তিবাদ অক্ষুণ্ন রেখেও যে বেঁচে থাকা চলে, এই বাস্তবতার সঙ্গেও তার কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু তারপরও মানুষ এরসঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। এটা হচ্ছে মানুষের পরস্পরবিরোধী সত্তা। এই সত্তার কারণেই সে মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে বিশ্রী প্রতারণায় লিপ্ত হয়। এখন আমার প্রশ্ন : এই পরস্পরবিরোধী সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কাছ থেকে আমরা অধিক কী আশা করতে পারি? মানুষের ওপর আশীর্বাদের ঝরনাধারা ঢেলে দিন কি তাকে সুখের সমুদ্রেই ডুবিয়ে রাখুন, কোনো লাভ নেই। দু-চারটে অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ সে দেবেই। রুটি-রুজির ঝুঁকি নিতেও সে রাজি, তবু যেন কিসের প্রণোদনায় নিজেই ছুটবে ধ্বংসাত্মক আকাঙ্ক্ষার পিছু পিছু। সে যে যন্ত্র নয়, সে যে বেহালার ছড় নয়, তাকে বাজালেই সে যে বাজবে না—এই সত্যটুকু প্রমাণের জন্য সে ওই অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটবে। এখানেই শেষ নয়। সে যদি যন্ত্রও হত, যদি বিজ্ঞান আর গণিত তা প্রমাণও করত, তবু সে কেবল অকৃতজ্ঞতার বশেই যুক্তিহীন আচরণ করত ; এমন সব কাজে লিপ্ত হত যা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। সে আসলে নিজের পাল্লা ভারি করতে চায়। কোনো উপায় খুঁজে না পেলে সে একটা অনর্থ ঘটাবে, সব

লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইবে। তবু তার পাল্লা ভারি হওয়া চাই। সে সারা পৃথিবীর মাথায় অভিসম্পাত ঝরিয়ে দেবে। সে তো জানে, মানুষ হবার এইটেই সুবিধে। অন্য প্রাণীরা অভিশাপ দিতে জানে না। মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এইসব অপকর্ম করবে আর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে, সে মানুষ, সে যন্ত্র নয়, বেহালার ছড় নয়। মানুষের এই দুর্বলতাটুকুর কথা আমি জানি এবং বিশ্বাস করি। সে যে-কোনো মূল্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তার সাধ-আকাঙ্ক্ষা হিসেবের ছকে মেলানো যায় না। সে জীবন দিতে তৈরি ; হয়তো সে মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে—তবু প্রমাণ করবে, সে কারুর নাচের পুতুল নয়, সে মানুষ। এরকম অবস্থায় কেউ কেউ আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবতেই পারে, আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা এমন কোনো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যা আমরা জানি না।

আপনি চিৎকার করে বলবেন, (মানে, যদি আপনি চান আর কি) কেউ তো আমার স্বাধীন ইচ্ছার গায়ে আঁচড় বসাচ্ছে না। সবাইকে শুধু একটা ব্যাপারে মাথা ঘামালেই চলে—তা হচ্ছে, আমার ইচ্ছা নিজের ইচ্ছার সঙ্গেই লড়ছে, বিরোধ করছে স্বার্থেরই সঙ্গে ; প্রকৃতির বিধান আর অঙ্কের সঙ্গে।

কী মুশকিলের কথা, বলুন তো ভাই, হিসেবের ছকের গণ্ডিতে স্বাধীন ইচ্ছার কোনো দাম আছে? স্বাধীন ইচ্ছা কী করবে যখন দুইয়ে দুইয়ে চার হয়? আমার ইচ্ছার তোয়াক্কা না রেখেই দুই আর দুই যুক্ত হয়ে চার হয়ে যায়। নিয়তি কি এভাবেই ইচ্ছার মূল্য দেয়?

নয়

ঠাট্টা করছিলাম, ভাই। এও জানি, আমার ঠাট্টা খুব উঁচুমানের নয়। কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে, কেউ সব কথা ঠাট্টা হিসেবে নিতে পারে না। হয়তো আমার কৌতুক প্রচলিত ধারার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি, ভাই, প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জর হয়ে আছি ; দয়া করে উত্তর দিন। ধরুন, আপনি মানুষকে পুরোনো অভ্যেস আর গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞান আর সুপ্রবৃত্তি অনুসারে তার ইচ্ছা সুসংস্কৃত করতে চান। কিন্তু এটা যে সম্ভব আর এটাই যে কাম্য, তা কীভাবে জানলেন? আর এই সিদ্ধান্তেই বা পৌঁছলেন কী করে যে মানুষের প্রবৃত্তির সংস্কার দরকার? সংক্ষেপে, কেমন করে বুঝতে পারলেন যে এরকম সংস্কারে মানুষের কল্যাণ হবে? বিষয়টির একটু গভীরে গেলে আরও একটা প্রশ্নের দেখা মিলবে। যুক্তি আর অঙ্কের সিদ্ধান্ত মানুষের যেসব প্রকৃত সাধারণ স্বার্থ সুনিশ্চিত করেছে তার বিরুদ্ধে না যাওয়াটাই যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ, এবং এটাই যে শেষ পর্যন্ত মানব সমাজের নিয়ম হওয়া উচিত—এ-বিষয়ে নিঃসংশয় ধারণা আপনি কোথায় পেলেন?

আসলে কী জানেন, এসব কেবলই আপনার ধারণা। এটা যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম হতে পারে, কিন্তু মানবতার নিয়ম নয়। আমাকে পাগল ভাবছেন, তাই না, ভাই? কিন্তু তার আগে আমাকে দুটো কথা বলতে দিন। স্বীকার করছি, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে সৃষ্টিশীল। পথ যেদিকেই যাক, দিকচিহ্ন ঠিক রেখে সে-পথ তৈরি করাই তার কাজ। কিন্তু তারপরও দেখা যাবে, পথ ছেড়ে বেপথে পা বাড়িয়েছে সে। কেন? ওই স্খলনই তার ভবিতব্য এমনকি এও হতে পারে যে সে ভেবেছিল, পথ যত বিদপসঙ্কুল আর অপরিচিত হোক-না কেন, কোথাও-না-কোথাও তো শেষ হবেই। পথ তৈরি করার তাবৎ শ্রমের তুলনায় সে-গন্তব্য জরুরি নাও হতে পারে, তবু বাস্তববাদী মানুষের উচিত পথ রচনার কষ্টকে ঘৃণা করার পথ থেকে সুবোধ বালকদের মতো ফিরে আসা। কারণ ওই ঘৃণা থেকে তার মধ্যে ধ্বংসাত্মক আলস্যের জন্ম দেবে—যা থেকে আবার জন্ম নেবে হাজারটা দোষ।

এটা অবিসংবাদিত সত্য যে মানুষ পথ তৈরি করতে চায়, সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু ধ্বংস আর গোলযোগের প্রতিও তার অমন উগ্র অন্ধ প্রেম জন্মায় কেন, বলুন? আমার মতে, এর কারণ, মানুষের একটা সহজাত আশঙ্কা হচ্ছে সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না এবং কল্পনায় যে প্রকাণ্ড সৌধ নির্মাণে হাত দিয়েছে তা শেষ করতে ব্যর্থ হবে। কে জানে, হয়তো সে শুধু দূর থেকে ওই প্রাসাদ দেখেই খুশি থাকতে চায়, সেখানে গিয়ে ভালোবেসে বাস করতে চায় না। সে শুধু ওই প্রাসাদ নির্মাণ করবে ; আর তাতে থাকবে পিঁপড়েরা। পিঁপড়ের রুচি অবশ্য আলাদা ; তারা নিজেরাই বিশাল প্রাসাদ গড়তে জানে। দেখেছেন তো তাদের ঢিবিগুলো।

এই যে পিঁপড়ের কথা বললাম, এদের শুরু যেমন ওই ঢিবি দিয়ে, শেষটাও তেমনি ওই ঢিবিতে। এদের জীবন কিন্তু বৃথা নয় ; বরং অধ্যবসায় আর শিল্প-মাধুর্যে পরিপূর্ণ, সফল। কিন্তু মানুষ হচ্ছে ছেলেমানুষ ; মূর্খ ; বিদ্‌ঘুটে প্রাণী। অনেকটা দাবাড়ুর মতো। খেলার প্রক্রিয়া পছন্দ করে, কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেই। আর কে জানে (কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না) হয়তো এই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্জনের চেষ্টা ; অর্জিত বিষয় এমন কিছু নয়, যে তাকে 'দুয়ে দুয়ে চার'-এর মতো সূত্রাকারে প্রকাশ করা যাবে। কিন্তু এই সত্য তো জীবন নয়, ভাই, বরং বলা যায় মৃত্যুর শুরু। যে-কোনো কারণেই হোক, মানুষ চিরদিন গণিতের এই স্বতঃসিদ্ধকে ভয় পেয়েছে। এখন আমারও ভয় লাগছে। মানুষ চিরকাল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, আবিষ্কারের নেশায় জীবন দিয়েছে। কিন্তু পার হওয়া আর আবিষ্কার করতে পারা সব সময়েই তার কাছে ভয়ঙ্কর। তার মনে হয়েছে, পথ খুঁজে পেলেই তো শেষ হয়ে যাবে পথ। ধরুন শ্রমিকদের কথা। দিনের কাজ যেই শেষ হল, সে মজুরির জন্য হাত বাড়াবে। তারপর গিয়ে বসবে কোনো শুঁড়িখানায় ; হয়তো সেখান থেকে থানায়। এভাবে সপ্তাহ কেটে যাবে। কিন্তু আসলে সে কোথায় যাবে? যাবার পথ

নিয়ে মশগুল থাকতেই সে ভালোবাসে। কিন্তু কখনই গিয়ে পৌঁছতে চায় না। মানুষ আসলে ভারি রগুড়ে প্রাণী। সবকিছুর ভিতরে তার মজা থাকা চাই। অঙ্কের বিধান কখনও কখনও তার কাছে অসহ্য উপদ্রব হয়ে উঠতে পারে। এই যে, দুইয়ে দুইয়ে চার ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ বেয়াদবি মনে হয়। দুইয়ে দুইয়ে চার যেন এক অসভ্য মস্তান ; কোমরে হাত দিয়ে আপনার চলার পথে দাঁড়িয়ে আছে। স্বীকার করি, দুইয়ে দুইয়ে চার খারাপ নয়, কিন্তু কখনও কখনও সত্যিকার মজা হত যদি দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ হযে যেত।

আচ্ছা কেন, একেবারে দিব্যি দিয়ে বলছেন, মানুষের জন্য কল্যাণকর জিনিসটাই তার সুবিধা? ভুলের ভিতরেও তো অনেক যুক্তি লুকিয়ে আছে, হয়তো সেটাই তার মুক্তি! সুখে থাকার পরও সে কি সাধ করে অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করে না? ওই কষ্ট কি তার কাছে পরমানন্দ হতে পারে না? এটাই বাস্তব, মানুষ অনেক সময় দুঃখ-কষ্টেরই প্রেমে পড়ে। এর প্রমাণের জন্য আপনার বিশ্ব-ইতিহাস ঘাঁটার দরকার নেই। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আপনি যদি সত্যি মানুষ হন, যদি সত্যি সত্যি জীবন যাপন করে থাকেন, তবে আপনিই তার প্রমাণ। আর আমার নিজের মতামতের কথা যদি বলেন, তো জানিয়ে দিই, শুধুমাত্র সচ্ছলতার জন্য মাথা ঘামানো আমার একেবারে অশিষ্ট ব্যাপার মনে হয়। ভেঙেচুরে দেয়ার মূলে ভালো কি মন্দ যা-ই থাক, এর মধ্যে কিন্তু একটা মাধুর্য আছে। ভোগান্তি কিংবা আয়েশ--কোনোটার ব্যাপারেই আমি লালায়িত নই। আমি চাই খেয়ালখুশিমতো চলতে, আর তার নিশ্চয়তার জন্য যদি কিছু করার দরকার হয়, সেইটুকু করতে। নাচ-গানের ঝরনাধারার ভিতর দুঃখ-কষ্টের স্থান কোথায়? 'মর্মরের প্রাসাদে' দৈন্যের ক্লেশের কথা ভাবাই যায় না। ক্লেশ মানে সংশয়, সংহার। তাহলে আর মর্মরের প্রাসাদের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় মানুষ কোনোদিন দুঃখ-দুর্দশার অধিকার—মানে ধ্বংস আর গোলযোগের সুযোগ হারাতে চাইবে না। আরে, সচেতনতার একমাত্র উৎসই তো দুঃখ-দুর্দশা! যদিও প্রথমদিকটায় বলেছি, সচেতনতা মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, তবু জানি, মানুষের কাছে এর মূল্য অপরিসীম, আর কোনো চাওয়া-পাওয়ার বিনিময়ে তাকে সে হারাতে চাইবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'দুইয়ে দুইয়ে চার'-এর চেয়ে সচেতনতা বড়। জীবনের সব হিসেব যদি আপনার মিলে যায়, তবে পঞ্চইন্দ্রিয় অবদমন করে ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া ছাড়া আপনার করার কী থাকবে, বলুন? আর যদি সচেতনতা আঁকড়ে ধরেন, কী হবে? ফলাফল অভিন্ন থাকলেও অন্তত মাঝে মাঝে নিজেকে চাবুক কষতে পারবেন ; বাঁচতে পারবেন প্রতিক্রিয়াশীলতার গ্রাস থেকে।

দশ

নিশ্চয় মানবেন, স্ফটিকের প্রাসাদ ধ্বংস করা যায় না। এরকম অট্টালিকা দেখলেই তাই আমার ভয় লাগে। ইচ্ছে করলেই তো আর ভাঙা যায় না। ধরুন আমার আশ্রয়স্থল কোনো প্রাসাদ নয়, মুরগির খুপরি। এর ভিতরে মাথা গুঁজে আমি রোদ–বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করি। কিন্তু তাই বলে কি নিছক কৃতজ্ঞতার বশে একে প্রাসাদ বলব? আপনি হেসে বলবেন, এরকম অবস্থায় মুরগির খুপরিকে প্রাসাদ বললে ক্ষতি কী? আমার উত্তর কোনো ক্ষতি নেই, যদি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় রোদ–বৃষ্টি থেকে শরীর বাঁচানো।

আর যদি আমি স্থির করি, জীবনের উদ্দেশ্য সেটা নয়, যদি ভাবি, ঠিকমতো বাঁচতে হলে প্রাসাদেই বাস করা উচিত, তখন কী করব? সেখানেই আমার পছন্দাপছন্দ, আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার পছন্দের ব্যাপারটা বদলে না–দেয়া পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করতে পারছেন না আপনি। বেশ তো, বদলে ফেলুন। অন্য কোনো জিনিসে প্রলুব্ধ করুন আমাকে। দিন না অন্য কোনো আদর্শ। কিন্তু ততদিনের জন্য প্রাসাদের বদলে মুরগির খুপরিতে থাকতে রাজি নই আমি। হোক–না স্ফটিকের প্রাসাদ এক আকাশ–কুসুম ছাড়া কিছু নয়। হয়তো প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য নেই তার। বোকার মতো নিজেই ওইসব কল্পনা করি। কিন্তু তাতে আমার কী? যতক্ষণ আমার কল্পনায় তার অধিষ্ঠান, ততক্ষণ চিন্তার কিছু নেই। আবার হাসছেন, তাই না? হাসতে থাকুন। 'পেটে খিদে নিয়ে মুখে লাজ' দেখানোর বদলে আমি বরং ধৈর্যসহকারে উপহাস সহ্য করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আপস করব না, মস্ত ভুয়া হিসেবে প্রতিপন্ন হব না। কারণ প্রকৃতির বিধানে ওরকমটি চলে না। গরিব মানুষের জন্য তৈরি খুদে একটা ফ্ল্যাটবাসা নিশ্চয়ই আমার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা হতে পারে না। তাই যদি হয় তবে আমার আকাঙ্ক্ষা তচনচ করে দিন ; ধুয়েমুছে বিলীন করে দিন আমার আদর্শ। আমাকে নতুন কিছু দেখান। ভালো কিছুর সন্ধান দিন। আমি আপনার পিছনে আছি। আপনি বলবেন, সেটা আপনার মাথাব্যথা নয়। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও তাই বলব। আমরা কিন্তু কেউ ইয়ার্কি করছি না ; আমার সমস্যা নিয়ে ভাবতে যদি আপনার ইচ্ছে না থাকে আমিও কেটে পড়ব আপনার কাছ থেকে সোজা গিয়ে আশ্রয় নেব ভূগর্ভে—আমার ইঁদুরের গর্তে।

না হয় নিলাম। কিন্তু সে আর কতদিন? এটা তো জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। আমার কী মনে হয়, জানেন? আমরা যারা গুপ্তজীবন যাপন করি তাদের মুখে লাগামের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ যেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসব দিনের আলোয়, অমনি চল্লিশ বছরের নৈঃশব্দ্য ভেঙে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়বে কথা কথা কথা ।

তো ভাই, মোটের ওপর কথা হল, কিছু না-করাই সবচেয়ে ভালো কাজ। সচেতনভাবে জড় থাকাই উত্তম। আর তাই ... ইঁদুরের গর্ত জিন্দাবাদ! যদিও বলেছি আমি সর্বান্তঃকরণে সাধারণ মানুষদের ঈর্ষা করি তবু তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না (তার প্রতি ঈর্ষা অবশ্য অক্ষুণ্ন থাকবে)। না, না, এই ভূগর্ভের জীবনই তো ভালো। এখানে অন্তত...ধেত্তেরি... এখনও মিথ্যে বলে যাচ্ছি। যা ভালো, যা সুবিধার, তা এই ইঁদুরের জীবন নয়, অন্যকিছু—যা আমি এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু পাচ্ছি না। চুলোয় যাক এই ভূগর্ভবাস!

অন্য একটা কথা আপনাদের বলব। আসল কথা। মানে এতক্ষণ যা লিখেছি তার মধ্যে যদি একটি কথাও বিশ্বাস থেকে লিখে থাকি, তো সে হচ্ছে এই। কসম কেটে বলছি, ভাই, এই রচনার মধ্যে এমন একটি কথাও নেই যা আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি। মানে, যখনি মনে হয় হয়তো বিশ্বাস করি, ঠিক একই সঙ্গে মনে হয়, আমি মুচির মতো মিথ্যে কথা বলছি।

'তা হলে এসব লিখেছেন কেন?' আপনি বলবেন। 'আমার উচিত আপনাকে চল্লিশ বছর কোনো কাজ করতে না দিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা। তারপর আপনার খুপরিতে এসে দেখতে চাই কী অবস্থায় পৌছেছেন। চল্লিশ বছর কোনো কাজ না করে মানুষ কীভাবে বাঁচে?'

আপনি অবজ্ঞায় মাথা দুলিয়ে বলবেন, 'ভারি লজ্জার কথা না? বিব্রতকর অবস্থা না? আপনি জীবন ভালোবাসেন, যুক্তিসঙ্গত উপায়ে জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান চান। অথচ কী উদ্ধত, কী একরোখা আক্রমণ আপনার! একই সময়ে আপনি ভয়ে কণ্টকিত হয়ে আছেন। যা মুখে আসছে, বলে যাচ্ছেন, তাতেই আপনি খুশি। অভব্য অশ্রাব্য গাল দিচ্ছেন, আবার ক্ষমাও চাইছেন। ঘোষণা করছেন, আপনি কাউকে ভয় পান না, আবার একই সময়ে আমাদের ভালো কথাগুলো শুনে কৃতার্থের হাসি হাসছেন। সদম্ভে চিৎকার করে বলছেন, দাঁতে দাঁত ঘষছেন, অথচ আমাদের খোশামোদ করার জন্য মজার-মজার বুলি ছাড়ছেন। খুব ভালোভাবেই জানেন, আপনার রসিকতার মধ্যে কোনো রস নেই, তবু দাবি করছেন, আপনার কথা মহামূল্যবান। হয়তো অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে জীবনে, কিন্তু তার প্রতি আপনার কোনো শ্রদ্ধা নেই। হয়তো আন্তরিকতা আছে, কিন্তু আপনার মাধুর্যের অভাবে সেটা ঢাকা পড়ে যায়। অহঙ্কারে একফোঁটা চোট লাগলেই আপনি কলঙ্ক আর বদনাম বিষয়ে দৃশ্যত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিঃসন্দেহে আপনি কিছু বলতে চান, কিন্তু কিসের যেন ভয়ে শেষ পর্যন্ত কথাটা চেপে যান, কারণ বলবেন কি না সিদ্ধান্ত নেন নি। তা ছাড়া এক ধরনের কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্যও আছে আপনার। সচেতনতা আপনার ভালো লাগে না,

কিন্তু নিজের কোনো গোপন বিশ্বাসও নেই। কারণ মনটা যদিও বা কাজ করে, আপনার হৃদয় কিন্তু অন্ধকার, সিঁদেল চোর। জানেন তো, পবিত্র হৃদয় ছাড়া পূর্ণ প্রকৃত সচেতনতার কল্পনাই করা যায় না। অন্যের ব্যাপারে খামোকা নাক গলান আপনি ; কী বিশ্রী ভাষায় সমালোচনা করেন ! ভুয়া ! ভুয়া ! ভুয়া !'

আপনার এই কথাগুলো অবশ্য আগাগোড়া আমারই বানানো। তাও আবার ভূগর্ভ থেকে। চল্লিশ বছর ধরে মেঝের ফাটলের ওধার থেকে শুনছি। সেটাও আমার নিজের আবিষ্কার। কী করব ? অন্য কিছু তো আর আবিষ্কার করার জো নেই। তাই অবাক হবার কিছু নেই যে আপনার কথাগুলো শুনতে-শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে—যা এখন সাহিত্যের আকারে বেরুচ্ছে।

কিন্তু এত সহজেই কি আপনি বিশ্বাস করবেন যে এইসব আমি ছেপে বার করব, আবার আপনাকে পড়তেও দেব ? ও, আরও একটা সমস্যা। কেন যে ধরে নিয়েছি আপনি আমার পাঠক, কেন যে সেই শুরু থেকে ভাই-ভাই করছি, জানি না। যেসব স্বীকারোক্তি করতে চাই তা কখনও ছাপা যায় না, অন্যকে পড়তেও দেয়া চলে না। তো   সে যা-ই হোক, অতখানি শক্তমনের মানুষ আমি নই ; কিংবা হতে চাইও না। কিন্তু কী জানেন, মনটা হঠাৎ ভাবুক হয়ে উঠেছে। সেটা না জানালেই নয়। ব্যাখ্যা করে বোঝাই, শুনুন।

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু স্মৃতি আছে—যা সে সবাইকে বলতে পারে না   শুধু বলতে পারে অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে। তার আরও কিছু কথা আছে—সেগুলো বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ করা যায় না—শুধু নিজের কাছে বলা যায়, তাও একান্ত গোপনে। এরপরও কিছু ব্যাপার আছে—যা এমনকি নিজের কাছেও ফাঁস করতেও ভয় পায় মানুষ। প্রত্যেক সুন্দর মানুষের গভীর গোপনে এমন অনেক কথা জমে আছে। সে যত সুন্দর হবে, মনের গোপন কোণের ভাণ্ডার ততই ভরে উঠবে সেই গোপন বিষয়ে। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছি আমার প্রথম জীবনের কিছু ঘটনা স্মরণ করব। সেই ধরনের ঘটনা যেগুলোকে এতকাল জড়তার কারণে এড়িয়ে এসেছি। শুধু তো স্মরণ করা নয়, ঘটনাগুলো নিয়ে যখন একটা কিছু লিখব ভেবেছি, তখন পরীক্ষা করে দেখাই যাক না, সত্যকে ভয় না-পেয়ে পুরোপুরি তার মুখোমুখি হওয়া যায় কি না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে হাইনের কথাটা স্মরণ করে নিতে হচ্ছে   'সত্যিকার আত্মজীবনী প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ; মানুষ নিজের সম্পর্কে খানিকটা মিথ্যে বলবেই।' তিনি ধরে নিয়েছিলেন, রুশো অবশ্যই তাঁর আত্মকথায় মিথ্যে বলেছেন, হয়তো ইচ্ছে করেই, হয়তো আত্মাভিমানের কারণে। আমার তো মনে হয়, হাইনে ঠিকই বলেছেন। মান বাঁচানোর জরুরি তাগিদে মিথ্যে বলাই স্বাভাবিক ; আমিও তাই করব। কিন্তু হাইনে যাঁদের কথা বলেছেন তাঁরা সবাই জনসমক্ষে স্বীকারোক্তি করেছেন। আমার কথা আলাদা। আমি শুধু নিজের জন্য লিখি। লেখা পড়ে মনে হতে পারে, আমি পাঠকদের সঙ্গে কথা বলছি ; কিন্তু পাকাপোক্তভাবে এই জানিয়ে রাখলাম যে এভাবে লেখার একমাত্র কারণ—এই

ধরনের রচনায় আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এটা একটা ধরন মাত্র ; আর কিছু নয়।

এই যে নোটগুলো লিখছি, এগুলোর সঙ্কলন করার ব্যাপারে আমি কোনো বাধা-নিষেধের কাছে নতি স্বীকার করব না। আমি কোনো প্রক্রিয়া-পদ্ধতির তোয়াক্কা করি না। যখন যা মনে আসবে লিখে রাখব, ব্যস্।

কিন্তু এখানে হয়তো কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে বসতে পারেন যে আমি কোনো প্রক্রিয়া-পদ্ধতির তোয়াক্কা করি কি না-করি সে তো আমার নিজস্ব ব্যাপার। সে-ব্যাপারে আমি এত আত্মপক্ষ সমর্থন করছি কেন? কেন দিচ্ছি এত কৈফিয়ত?

হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা। আমি বলব।

এর মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে। এমনও হতে পারে যে আমি আসলে কাপুরুষ। আর হয়তো সে-কারণেই মনে-মনে নিজেকে কেউকেটা করে নেবার জন্যই লেখার সময় সামনে এক বিশাল জনতার সমাবেশ কল্পনা করে নিই। এর হাজারটা যুক্তি থাকতে পারে। পুরোনো প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে। লেখার উদ্দেশ্য তবে কী? মনের কথা মনে রাখলেই তো চলে। কাগজে ফুটিয়ে তোলার দরকার কী?

কথা ঠিক। কিন্তু ওই যে   কাগজে ফুটিয়ে তুললে মনের কথাটা আরও সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। আরও আকর্ষক ব্যাপার আছে এতে। নিজের মনের কথাগুলো সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা যায় ; ভুল ধরা যায় ; আরও সুন্দর করে তোলা যায়। এ ছাড়া লিখে আমি অনেকটা হাল্কা বোধ করি। আজকের কথাটাই বলি। আজ আমি সারাদিন মনঃপীড়ায় ভুগেছি—অনেক পুরোনো এক স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে। নাছোড়বান্দা, বিরক্তিকর গানের সুরের মতো সেই স্মৃতি আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। কিছুতেই তার হাত এড়াতে পারছিলাম না। কিন্তু এড়াতে তো হবেই। এভাবে কষ্ট পাবার তো কোনো মানে হয় না। একটা উপায় বার করতেই হবে। আমার এমন অনেক স্মৃতি আছে। কিন্তু কী হয় জানেন, স্মৃতিগুলোর ভিতর থেকে একটা হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। তারপর সে যে কী নির্যাতনটাই করে! তো   মনে হল, যদি লিখতে শুরু করি, নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পারব। চেষ্টা করেই দেখা যাক না!

আরও ব্যাপার আছে। আমার জীবন তো একঘেয়ে। আমার কিছুই করার নেই। লেখাটা তো এক ধরনের কাজ, নাকি? লোকে বলে, কাজ মন ভালো করে দেয় ; হৃদয়কে সৎ করে তোলে। তো   একটা সুযোগ যখন পেয়েছি   দেখি না, কী হয়!

আজ বরফ পড়ছে। হলদেটে, মলিন। কালও বরফ পড়েছে, কদিন আগেও। মনে হচ্ছে, এই ভেজা বরফই আমার সেই পুরোনো স্মৃতি উসকে দিয়েছে—যা কিছুতেই আর মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। তাহলে গল্পটা হোক তুষারপাতের গল্প।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুষারপাতের গল্প

'যবে মোর সকরুণ মিনতি তোমার
ভুল তমসার পরাক্রান্ত গ্রাস থেকে
ম্রিয়মাণ আবেগের খুলে দেয় দ্বার ;
যে পাপ তোমার সত্তা রেখেছিল ঢেকে
ফিরে চাও সেই দণ্ডে সেই বৈরী পাপ
রক্তাক্ত হৃদয় জুড়ে রাখো তার স্মৃতি।
তবু তুমি আপনারে দাও অভিশাপ—
তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার এ কেমন রীতি?
যেদিন তোমার দ্বারে দাঁড়ালাম এসে
জীবনের সব কথা প্রকাশিলে, প্রিয়,
যেদিন এলিয়ে পড়ো শিহরিত ক্লেশে
অশ্রুভারে গেছে ঢাকি নম্র মুখটিও।

দুঃসহ স্মৃতির ভারে জর্জরিত, তাও
অবিনীতা বিদ্রোহিণী রুখিয়া দাঁড়াও।'
—নেক্রাসভ

এক

তখন আমার বয়স মাত্র চব্বিশ। জীবনটা তখনও হতাশায় অন্ধকার, ছন্নছাড়া আর বাউণ্ডুলের মতো নিঃসঙ্গ। কারুর সঙ্গে বিশেষ মিশি না, আলাপ এড়িয়ে যাই, মাথা গুঁজে পড়ে থাকি নিজের গর্তের ভিতর। অফিসে গিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করি ; কারুর দিকে তাকাই না। বেশ বুঝতে পারি, অন্য সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার ধারণা, তাদের দৃষ্টিতে এক ধরনের ঘৃণার ছাপ। ভেবে পাই না কেন সবাই শুধুমাত্র আমার প্রতি বিরূপ বলে আমার মনে হয়। এক কেরানির কথা না বললেই নয়। তার মুখ কদাকার ; গুটিবসন্তের দাগওলা অতি কুৎসিত চেহারা। তার মুখের দিকে তাকানোর সাহসই পেতাম না। আর এক কেরানি ছিল—তার কাপড় থেকে এমন বদগন্ধ বেরুত যে তার ধারেকাছে দাঁড়ানো মুশকিল।

কিন্তু তারা তো স্রেফ নির্বিকার। মুখ কিংবা পোশাক কিংবা আচরণ—কোনোকিছু নিয়েই তাদের সমস্যা নেই। কে তাদের দিকে তাকিয়ে কেমন বোধ করছে—তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তাদের বয়েই গেছে। এখন বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারি, নিজের মতো করে রুচি আর ব্যক্তিত্ববোধের একটা মান তৈরি করে নিয়েছিলাম। তাই আশেপাশে খারাপ কিছু দেখলে বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। এমনকি নিজের চেহারা নিয়েও আমার অসন্তোষের অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে বিষম রাগ হত নিজের ওপর ; সে-রাগ অন্যদের ওপরও গিয়ে পড়ত। তাই অফিসে এসে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম একা থাকতে। মুখে একটা দাম্ভিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতাম, যাতে অসহায় অবস্থাটা ধরা না পড়ে। ভাবতাম, 'চেহারা তো কুৎসিত। এ অবস্থায় মুখে অহঙ্কারী সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত ভাব যদি মুখে না থাকে, চলবে কী করে?' কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা। কোনোমতেই অসহায় অবস্থাটা আড়াল করতে পারি নি। উল্টে, বেশ বুঝতে পারতাম, আমাকে বোকা-বোকা দেখাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আমার যে আসলে চালাক আর চটপটে হওয়া উচিত ছিল—এই ভাবনা আমাকে অস্থির করে তোলে।

সন্দেহ নেই, সহকর্মী কেরানিদের বিষম ঘৃণা করতাম, অপছন্দ করতাম। একই সঙ্গে তাদের ভয়ও পেতাম। কখনও কখনও মনে হত তারা বুঝি-বা আমার চেয়েও বড় মাপের মানুষ। তাদের ঘৃণা করা আর বড় ভাবা—এর মাঝামাঝি ঘটত ব্যাপারটা। নিজেকে খুব উঁচু আসনে না বসিয়ে কিংবা অন্যদের তুচ্ছ গণ্য না করে কোনো সুসংস্কৃত সুন্দর মানুষ এইরকম ধারণায় উপনীত হতে পারে না। তবু আমি সাহস পেতাম না ওই কেরানিদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে। এমনকি, কী আর বলব, চেষ্টা করেও দেখেছি তাদের কারুর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা যায় কি না। প্রতিবারেই আমি ব্যর্থ। নিজের চোখই নামিয়ে নিতে হয়েছে আগে। ব্যাপারটা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল আমাকে। দিনদিন অন্তর্মুখী হয়ে উঠছি, অফিসের কাজ সেরে অন্য কোথাও না গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি নিজের একঘেয়ে ঘরের কোণে। বুকের আড়ালে অজ্ঞাত আশঙ্কা দুর্ভাবনা মোচড় দেয়। কিন্তু আমার করার কী আছে? স্পর্শকাতরতা আমাকে অসুস্থ করে রেখেছে। এর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। বোধ হয় ওই বয়সের ধর্মই ওইরকম। সবাই প্রায় একই ধাঁচের হয়ে থাকে তখন ; একইরকম বোকা। গোটা অফিসের ভিতর হয়তো আমি একাই ভাবতাম যে আমি কাপুরুষ ; ক্রীতদাসের মতো দেখাচ্ছে আমাকে। ব্যাপারটা স্বীকার করতে এখন অবশ্য একটুও সঙ্কোচ হচ্ছে না। ওই বয়সে প্রায় সবাই এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে ; নিজেকে কাপুরুষ কিংবা ক্রীতদাস ভাবে। এইটেই স্বাভাবিক। না, শুধু ওই সময়ের বিশেষ অবস্থার জন্য নয়। আমার মনে হয় একজন উন্নত মননশীলতার মানুষ সব সময়ই নিজেকে কাপুরুষ আর অপদার্থ ভাবে। সারা পৃথিবীর সব ভালো মানুষদের জন্য এই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। তাদের কেউ যদি কোনোকিছুর জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তাকে শান্ত করার

দরকার নেই, তার আত্মহারা হবারই বা কী আছে? এতে তার কাপুরুষতার লক্ষণই প্রকাশ পায়। এবং এখানেই এর সুনিশ্চিত, অবধারিত ইতি। তারপর ধরুন বেপরোয়া   কারা বেপরোয়া? কেবলমাত্র গাধা আর ইঁদুর। তাও কখন? যখন দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে যায়। তাদের তো চেতনার বালাই নেই। তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে?

আরও একটা বিষয় ওই সময় আমাকে বেশ দুর্ভাবনায় ফেলেছে। আমার মতো আর কেউ নেই ; আমিও অন্য কারুর মতো নই--এরকম একটা অনুভূতি সারাক্ষণই মনে জাগত। ভেবে-ভেবে সারা হতাম, 'আমি একা একদিকে, আর অন্যদিকে ওরা সবাই।'

এ থেকেই বোঝা যায় আমি কত নাবালক ছিলাম।

কোনো-কোনো সময় একেবারে বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। কখনও কখনও অফিসে যাওয়াটাই ছিল বিশ্রী বিরক্তিকর কাজ। ব্যাপারটা এত দূর গড়াত যে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে বাসায় ফিরতাম। হঠাৎ করে অদৃষ্টবাদ আর নির্বিকারত্ব আমার ওপর ভর করল। এসব একদিনে ঘটার কথা নয় ; কারণ আমার জীবনে সবই ঘটেছে পর্যায়ক্রমে, একটু একটু করে। অসহিষ্ণুতা আর খুঁতখুঁতানির জন্য নিজেকে উপহাস করেছি ; কষে নিজেকে গাল দিয়েছি নিজের রোম্যান্টিকতার জন্যে। কখনও কখনও কী যে হত, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করত না। আবার এক-একটা সময় আসত, তখন শুধু কথা নয়, জমিয়ে আড্ডা দিয়ে ভাব জমাতে ইচ্ছে হত অন্যদের সঙ্গে। কেন এমন হয়েছে—এ প্রশ্ন আমার কাছে আজও অমীমাংসিত। একবার তো বেশ কদিন ঘুরলাম এর-ওর সঙ্গে, বন্ধুত্ব করলাম, তাদের বাড়ি গেলাম, ভদকা খেলাম, প্রমোশন নিয়ে গাল-গল্প করলাম... কিন্তু এবার একটু প্রসঙ্গান্তরে যেতে হচ্ছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা রাশিয়ানরা কিন্তু জার্মান বা ফরাসিদের মতো আবেগপ্রবণ রোম্যান্টিক নই। কোনো ভূমিকম্পে গোটা ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে গেলেও ফরাসিদের আবেগী স্বভাব এতটুকু পাল্টাবে না, বোকার মতো মৃতদের সামনে নিয়ে তারা ভাবের গান গাইবে। আমাদের রাশিয়ায় ওইরকম বোকা লোক পাওয়া যাবে না। এই হচ্ছে বিদেশিদের থেকে আমাদের পার্থক্য। কেন এমন হয়েছে রাশিয়ানরা? আমার ধারণা   কোস্তানজোগলোস আর আঙ্কল পিওত্র ইভানিচের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার জন্য। তাঁরাই ছিলেন আমাদের মতো বোকা মানুষদের আদর্শ। তাঁরা আমাদের রোম্যান্টিক বিষয়গুলোকে রীতিমতো কলঙ্কিত করেছেন, তাঁদের কাছে এসব ছিল সেই জার্মান কিংবা ফরাসি রোম্যান্টিকতার মতোই। কিন্তু আমাদের রোম্যান্টিকতা ইউরোপীয় ধাঁচের তো নয়ই, বরং ঠিক এর বিপরীত, ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। (সেই মান্ধাতার আমলের 'রোম্যান্টিক' শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি চাইছি পাঠকের কাছে থেকে, কিন্তু শব্দটা এখনও যথেষ্ট সম্ভ্রমপূর্ণ ; তা ছাড়া এর অনেক ভালো দিক আছে,

জনপ্রিয়ও বটে।) আমাদের 'রোম্যান্টিক' বিষয়গুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবকিছু উপলব্ধি করা সবকিছু দেখা এবং বিশেষ সময়ে এমন গভীরভাবে দেখা যা আমাদের অতি বাস্তববাদী মন দেখতে পায় না ; যে-কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা ; একই সময় কোনোকিছুকে ঘৃণা না করা ; নীতি গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ; কোনো বাস্তব প্রাপ্তিযোগের সুযোগ—এই যেমন বিনা ভাড়ায় সরকারি খরচায় বাসস্থান, পেনশন, সাজসজ্জা এইসব--ছেড়ে না-দেয়া, গীতিময় কাব্য থেকে আহরণ করা আবেগ-অনুপ্রেরণা ব্যবহার করে নিজের সব লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া আর তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা—তা হচ্ছে সব 'কল্যাণ আর শুভ'-র জন্য নিজেদেরকে অকল্যাণ আর অশুভ-র ছোবল থেকে লুকিয়ে রাখা—ঠিক যেমন করে লোকে কাপড়খণ্ডের ভিতর দামি মনি মানিক লুকিয়ে রাখে। আমাদের ভিতর রোম্যান্টিক মানুষটি কে? যে কিনা একই সঙ্গে মহা-উদার আর তার চেয়ে বড় পাজির পা-ঝাড়া। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি আপনাদেরকে এ-ব্যাপারে জোর গলায় বলতে পারি। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমানও বটে! কিন্তু কী ব্যাপার? এসব কী বলছি? রোম্যান্টিক মানুষকে বুদ্ধিমান হতেই হবে! যদিও অনেক নির্বোধ রোম্যান্টিক মানুষ আমাদের আশেপাশে আছে, তবু তাদের ঠিক রোম্যান্টিক বলে গণ্য করা যায় না।

একটা উপমা দিই। আমি আমার অফিসের কাজ একদম পছন্দ করতাম না। কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও চাকরিকে গালাগালি করি নি—কারণ চাকরিটা, আর যা-ই হোক, আমারই। হাজার হোক আমাকে এর জন্যে বেতন দেয়া হয়। পাঠক, লক্ষ করুন, আমি প্রকাশ্যে গালাগালি করি নি। চাকরিতে থেকে চাকরিকে প্রকাশ্যে গালাগালি করাটা—একজন রোম্যান্টিক মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব—বিশেষ করে যদি তার চাকরি পালটানোর ইচ্ছে না থাকে, অথবা যদি তাকে জবরদস্তি বার করে দেয়া না হয়। যদি কোনো কারণে তার মাথা বিগড়ে যায় তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তখন তো তার জন্য পাগলাগারদ রয়েছেই। স্পেনের রাজার মতো অবস্থা হলে আর উপায় কী? রাশিয়ায় কিন্তু গোলমাল করে কেবল হালকাপাতলা সুন্দর মানুষগুলো। রোম্যান্টিক মানুষেরা দলে-দলে উন্নতির শিখরে ওঠে ; সব উঁচুপদগুলো দখল করে ফেলে। আর তাদের প্রতিভা যে কত বিভিন্নমুখী তা আর বলে শেষ করা যাবে না। সবচেয়ে বিতর্কিত অনুভবগুলোর বেলায় তাদের বোধশক্তি এককথায় অতুলনীয়। সেইসব দিনে এই ভাবনাগুলো আমাকে যেমন সান্ত্বনা দিয়েছে, এখনও তেমনি দেয়। ওই একই কারণে আমাদের চারপাশে অনেক 'মহাপ্রাণ' মানুষ আছে--যারা সমূহ দুর্ভোগের মধ্যেও নীতিভ্রষ্ট হয় না। যদিও আদর্শের জন্য তারা একটুকুও ত্যাগ স্বীকার করতে নারাজ, না তারা এমনকি দাগি চোর , পাজির পা-ঝাড়া ; তবু অশ্রুসিক্ত চোখে তারা ঘোষণা করবে আদর্শের বুলি, যেন তারা সব অসাধারণ সাধু। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেই তো এমন

বদমাশ আছে, যারা বদমাইশি একটুও না-কমিয়ে দাবি করবে, তারা এক-একজন ফেরেশতা । আমাদের রোম্যান্টিক লোকগুলো যখন-তখন এমন ফিটফাট বাবুগোছের পাজি হয়ে যায়। (পাজি শব্দটা এখানে আদর করে ব্যবহার করছি।) হঠাৎ এমন সব জ্ঞানবুদ্ধির কথা বলে ফেলে যে অবাক না হয়ে লোকের উপায় থাকে না।

তাদের এই বিভিন্নমুখিতা সত্যি খুব বিস্ময়কর, কিন্তু আল্লাই জানে, এর ভবিষ্যৎ কী। নিশ্চয় খুব সামান্য নয় ! নির্বোধ দেশপ্রেম থেকে কিন্তু এই কথা বলছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছেন আমি ঠাট্টা করছি। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। আপনাদের ধারণা এই সবই আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি। আচ্ছা ভাই, উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করছি বিশেষ খাতিরে। মাফ করবেন, প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

বন্ধুদের সঙ্গে কখনও আমার সদ্ভাব ছিল না ; প্রায়ই ঝগড়া হত। এমন অবস্থাও হত যে মনে হত, ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমি একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলাম।

আগে তো বেশির ভাগ সময় কাটাতাম বাসায়, পড়াশোনা করে। বাইরের যেসব ঘটনা প্রতিনিয়ত আমার মনে বিচিত্র অনুভূতি ফেনিয়ে তুলত, সেগুলোর টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম ছিল বই। খুব কাজে দিয়েছে পড়াটা। উত্তেজনা, আনন্দ, বেদনা—সবই পেতাম বই থেকে। কিন্তু কোনো-কোনো সময় কী যে হত ! সাংঘাতিক বিরক্তিকর হয়ে উঠত সবকিছু। পড়াশোনায় চরম বিরক্তি নিয়ে আবার মাথা গুঁজতে হত গর্তের ভিতর—সেই নিঃসঙ্গ নির্জন ঘরে। খিচুনি দিয়ে কান্না আসত । ওইসময় একটা বদভ্যাসের পাল্লায় পড়ি। কী করব ? বই ছাড়া তো আর কিছু নেই। চারপাশে এমন কেউ নেই, কিছু নেই যাকে ভালোবেসে কাছে টানা যায়। মানসিক অবসাদে আমার প্রাণ যায় আর কি। প্রাণপণে কামনা করছিলাম একটা বেখাপ্পা বেয়াড়া ধরনের কিছু করে ফেলার জন্য। সেই কারণেই অভ্যেসটা ধরেছিলাম। নিজের সাফাই গাওয়ার জন্য এসব বলছি না কিন্তু না। মিথ্যে বলছি। সাফাই গাইতে চেয়েছিলাম। নিজের ভালো কে না চায়, ভাই ? কিন্তু এই যে মিথ্যে আমি তো মিথ্যে বলতে চাই না ; একবার কঠিন শপথ করেছিলাম, মিথ্যে বলব না।

গভীর রাতে নির্জনে একা সঙ্গোপনে সেই নোংরা অভ্যেস আমাকে পেয়ে বসত। এর জন্য কত যে নিন্দে-মন্দ করেছি নিজেকে, তবু অভ্যেসটা ছাড়তে পারি নি। নিজের মনে তখন আমি এক বিশাল ভুবন তৈরি করে নিয়েছি। তবু সদা ভয়ে ভয়ে থাকি বদভ্যাসের জন্য। এই বুঝি ধরা পড়লাম। যখন-তখন ভুতুড়ে জায়গাগুলোতে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম।

একদিন রাতে এক শুঁড়িখানার সামনে দিয়ে আসছি, আলো জ্বলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন ভদ্রলোকে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি দিয়ে মারামারি

করছেন। এরপর দেখি, ওঁদের একজনকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া হল। অন্য সময় হয়তো ঘটনাটা দেখে বিরক্ত হতাম। কিন্তু ওইসময় মনের অবস্থা যেন কেমন ছিল ...যে লোকটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়া হল, তার প্রতি বেজায় ঈর্ষা হল। এমন ঈর্ষা যে সাতপাঁচ না-ভেবেই আমি শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লাম। হয়তো মনের কোণে সাধ জেগে থাকবে, ওদের সঙ্গে মারামারিতে লেগে যাই আর ওরা আমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিক।

আমি মাতাল ছিলাম না। কিন্তু অবসাদ যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন কত কী-ই না ঘটতে পারে। আমিও একটা কিছু ঘটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই ঘটল না। ওরা বোধহয় আমাকে মারামারি করার উপযুক্ত বলে মনে করে নি, অন্তত জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়ার মতো তো নয়ই।

প্রথমেই ঠোকাঠুকি লাগল এক অফিসারের সঙ্গে। আমি বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। খেয়াল করি নি যে সবার পথটা আটকে রেখেছি। লোকটা সোজা আমার কাঁধ ধরে হিড়হিড় করে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে দিল ; তারপর যেন কাউকে দেখতেই পায় নি এমনি একটা ভাব করে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। ধাক্কা দিয়েছে, এটা হয়তো মেনে নিতাম, কিন্তু আমার দিকে না-তাকিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে—এ কখনও সহ্য হয়?

সত্যি সত্যি ঝগড়া বাধাতে চাইলে কী করতাম কে জানে? আর মারামারি হলে আমিই যে মার খেতাম তাতেও সন্দেহ নেই! আমি এক খুদে মানুষ, আর ওই অফিসার পাক্কা ছ-ফুট। নির্ঘাত আমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিত। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। চুপচাপ হার স্বীকার করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম বাসায় ; সব উদ্ভট আর গোলমেলে লাগছিল। পরদিন আবার গেলাম সেইখানে সেই একই বদ-মতলব নিয়ে। এবার আরও বেশি জেদ আর দৃঢ় পণ। চোখজোড়াও যেন জলে ছলছল করছে। তবু গেলাম। ভাববেন না যেন, কাপুরুষতার কারণে অফিসারটির কাছ থেকে কেটে পড়েছি। মনে মনে কখনই কাপুরুষ ছিলাম না, ভাই। হতে পারে, কাজে কখনও কখনও কাপুরুষতার প্রমাণ দিয়েছি। সাত তাড়াতাড়ি হেসে ওঠার কিছু নেই। পরে ব্যাখ্যা করে বলছি সব।

আহা! অফিসারটি যদি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে রাজি হত। কিন্তু সে তো আমাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মেনে নিতেই চায় নি। সে উল্টে বিলিয়ার্ডের লাঠি নিয়ে মারামারি করারই পক্ষপাতী। এরা কুস্তি লড়ার মধ্যে নেই। আমার মতো একজন সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে কুস্তি লড়ার কথা তারা ভাবতেই পারে না। এ যেন অসম্ভব ব্যাপার ; মুক্ত-চিন্তা কিংবা ফরাসি ভাষার মতোই কঠিন। কিন্তু গালাগালি করার ব্যাপারে তারা একপায়ে খাড়া—ছ-ফুট লম্বা তো, তাই।

কেটে পড়েছি—সেটা কাপুরুষতার কারণে নয়। প্রচণ্ড অভিমানে। আর ভয় পেয়েছি, তার কারণ এই নয় যে, তারা সব লম্বায় ছ-ফুট কিংবা আমাকে জানালা

দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। সত্য বলছি, আমার শারীরিক শক্তির অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু মনের জোরও তো থাকা উচিত। ভয় পেয়েছিলাম, তার কারণ সেখানে উপস্থিত বেয়াদব বিলিয়ার্ড খেলুড়ে থেকে শুরু করে তেল-চিটচিটে কাপড়-পরা নীচুশ্রেণীর কেরানিটি পর্যন্ত সবাই হাসতে শুরু করত যদি আমি প্রতিবাদ করতাম আর সাহিত্যের ভাষায় কথা বলতে শুরু করতাম। কর্তব্যের দায়েই আমরা শুদ্ধ সাহিত্যের ভাষা ছাড়া একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এখানে কাউকে বিশেষ খাতিরের কথা হচ্ছে না। আর ওই অভদ্র লোকগুলো কী করত, জানেন? আমাকে শুধু মৌখিকভাবে অপমান করত না, রীতিমতো আমার পিঠে নখ ঢোকাত, লাথি দিতে-দিতে বিলিয়ার্ড টেবিলের চারপাশ দিয়ে ঘোরাত, তারপর করুণাভরে ছুড়ে ফেলে দিত জানালা দিয়ে। সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত।

ঘটনাটা যতই তুচ্ছ হোক, মনে মনে আমি কখনই সেটা ভুলে যেতে পারি নি। পরে রাস্তাঘাটে অনেকবার ওই অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করেছি। ঠিক বলতে পারব না সে আমাকে চিনতে পারত কি না। হয়তো পারত না। কয়েকটা চিহ্ন দেখেই তা টের পেতাম। আমি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম তার দিকে এভাবেই চলেছে কয়েক বছর। যত দিন গেছে আমার আক্রোশও তত বেড়েছে। প্রথমটায় ওই অফিসার সম্পর্কে গোপনে খোঁজখবর নেয়া শুরু করেছি। কাউকে তো চিনি না ; কাজটা তাই বেশ কঠিন হল। একদিন দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে শুনি একজন তার বংশ-পদবি ধরে চেঁচাচ্ছে। তো এভাবে তার বংশ পদবি জানা হয়ে গেল। আরেকদিন পিছু নিয়ে পৌঁছে গেলাম তার ফ্ল্যাটে। বাড়ির সামনে দারোয়ানের পকেটে দশ কোপেক গুঁজে দিয়ে জেনে নিলাম সে কোথায় থাকে, কোন্ তলায়, সঙ্গে কে কে থাকে, এইসব—মানে দারোয়ানের কাছ থেকে যতটুকু জানা যায় আর কি। তারপর এক সকালে—যা কোনোদিন করি নি তাই করতে বসলাম। কাগজ-কলম নিয়ে শুরু করলাম তার চরিত্র ফুটিয়ে এক ব্যঙ্গরচনা লিখতে। মুখরোচক উপন্যাস হয়ে গেল দিব্যি! তার শয়তানির কথা এতে স্থান পেল। একটু বেশি করেই বলা হল অবশ্যি। প্রথমটায় তার পদবি এত কম ঘুরিয়ে ব্যবহার করলাম যে পড়ামাত্র তাকে চেনা যাচ্ছিল। কিন্তু পরে আবার ভেবে সেটা বদলে দিলাম। উপন্যাস পাঠিয়ে দিলাম এক বহুল প্রচারিত পত্রিকায়। তখনকার কালে এভাবে কাউকে ঘা দেবার চল হয় নি। আমার গল্পও ছাপা হল না। ব্যাপারটা বিশ্রী রকমের কষ্টকর লেগেছিল আমার কাছে।

মাঝে মাঝে রাগে অন্ধ হয়ে পড়ছিলাম। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, শত্রুর মুখোমুখি হব। চমৎকার একটা চিঠির খসড়া তৈরি করলাম, তাকে উদ্বুদ্ধ করলাম আমার কাছে ক্ষমা চাইতে। এমনভাবে লিখেছিলাম যাতে সুন্দর আর কল্যাণের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া যদি তার মধ্যে থাকে তো সে ছুটে এসে ক্ষমা চাইবে আমার কাছে, বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেবে। কী যে দারুণ ব্যাপার হবে তখন! আমি এক কল্পনার জোয়ারে

ভেসে বেড়াতে লাগলাম। 'সে তার উঁচু পদের গুণে আমাকে রক্ষা করবে আর আমি তাকে শেখাব পরিশীলিত রুচি, জ্ঞানের–আলো সঞ্চারিত করব তার মধ্যে' এই জাতীয় সব আকাশ–কুসুম আর কি। কিন্তু আল্লাহই বাঁচানেওলা, (আজকাল চোখের জলে ভেসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি) চিঠিটা তার কাছে পাঠাই নি। যদি পাঠাতাম, কী যে হত, ভাবলেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নামতে থাকে।

তারপর কী হল, হঠাৎ অতি সহজ এক উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলাম আমি। স্রেফ বুদ্ধির খেলা। তখন আমার একটা নিয়ম ছিল, ছুটির দিনে চারটের পর নেভস্কির ধার দিয়ে রোদে হেঁটে বেড়াতাম। এর মধ্যে প্রতিশোধের কোনো ব্যাপার ছিল না বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়াও তো আমার চাই–ই। বিশ্রী, জবরজং ভঙ্গিতে পথের একপাশ দিয়ে হাঁটি, সভয়ে জায়গা ছেড়ে দিই জেনারেল, অফিসার, গার্ড আর মহিলাদেরকে। এই সময়টা আমার খুব খারাপ কাটে ; মনের গভীরে প্রচণ্ড ব্যথার অস্তিত্ব টের পাই। প্রতি মুহূর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যু আমার জীবনটা বিপন্ন করে তোলে ক্রমাগত অপমানবোধ আর ক্ষুদ্রতায় জর্জর হই। মনে হয় আমি যেন মাছি ; নোংরা, বিরক্তিকর মাছি বারবার তাড়া খেয়ে, অপমানিত হয়ে, ঘৃণা সহ্য করে যে বারবার মুখের কাছে ফিরে আসে। এই আত্ম–অবমাননার অবিরাম ভার বয়ে তবু কেন আমি নেভস্কিতে যেতাম, জানি না। কেবল বুঝতাম, নিয়তির অদৃশ্য টানে কখন যেন সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি।

কিন্তু বিশ্বাস করবেন ভাই, তার মধ্যেও আমি আনন্দ খুঁজে পেতাম। ওই যে–আনন্দের কথা গোড়াতে বলেছি সেই আনন্দ। অফিসারটির সঙ্গে গোলমাল হবার পর লক্ষ করি, কেবল তার টানেই আমি নেভস্কিতে যাচ্ছি। প্রায়ই যাচ্ছি। উনিও নিয়মিত ওখানে আসেন ছুটির দিনগুলোতে। আমার মতো তিনি কিন্তু পথের কিনারা বেছে জেনারেল কিংবা আমার চেয়ে ঝকমকে দেখতে মানুষদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেন না। লক্ষ করি, আমরা ঠিক এক গোত্রের মানুষ নই। আমরা পাশাপাশি হাঁটি, তবু আমাদের চরণ মেলে না। আমি ওনাকেই জায়গা ছেড়ে দিই।

প্রচণ্ড রাগে উন্মত্তের মতো নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকি, 'তুমিই সবসময় আগে অন্যকে জায়গা ছেড়ে দেবে—এ কেমন কথা?' গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়। নিজের উদ্দেশে বেপরোয়া চিৎকার করে উঠি, 'তোমার একারই যত দায়? ওনার কি কোনো দায় নেই? কোনো লেখাপড়া–করা চুক্তি তো নেই। আইনও নেই। এমন হতে পারে না, দুজনেই পরস্পরকে জায়গা ছেড়ে দেবে! তুমি অর্ধেকটা উনি অর্ধেকটা। সভ্য মানুষের কাছে এটুকু আশা করতে তো কোনো দোষ নেই। এটাই তো পারস্পরিক সম্মান।'

কিন্তু কখনও তা হয় নি। আমিই সবসময় ওনাকে দেখে সভয়ে সরে গিয়েছি। উনি আমার দিকে ফিরেও তাকান নি ; যেন আমি ধারেকাছে কোথাও নেই, একেবারেই না। এইরকম সময়ে ওই ধারণাটা আমার মাথায় আসে। 'আচ্ছা এক বুদ্ধি করলে কী হয়? যখন কাছাকাছি আসব, আমি পথ ছেড়ে দেব না ; নিজের

জায়গায় অটল দাঁড়িয়ে থাকব। কেমন হবে?' এই উদ্ধত পরিকল্পনাটা আমার চৈতন্যকে বিষম গ্রাস করল। ঘুমাতে পারি না ; শান্তি পাই না। ঘটনাটা যখন ঘটবে, কেমন হবে, এই চিন্তায় দিশেহারা হলাম। যতই ভাবলাম, দেখলাম, ব্যাপারটা একটুও কঠিন নয়। কেবলই সহজ আর স্বাভাবিক।

খুশি-খুশি মনে ভাবি, 'তাই বলে সত্যি কিন্তু তাকে ধাক্কা দেব না, আমি শুধু পাশে সরে যাওয়া থেকে বিরত থাকব। মৃদু ধাক্কা লাগতে পারে পরস্পরের সঙ্গে—বড়জোর কাঁধ ছোঁয়াছুঁয়ি—এর বেশি কিছু নয়। সে যতটা জোরে ধাক্কা দেবে, আমিও ততটা বল প্রয়োগ করব, ব্যস।' অবশেষে এই সিদ্ধান্তটাই পাস করলাম। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে অনেকটা সময় লেগে গেল। পরিকল্পনাটা যখন বাস্তবায়িত করব তখন নিজের ফিটফাট ভাব আনার দরকার। দামি জায়গা। বিশিষ্ট সব মানুষ ওই রাস্তায় হাঁটাচলা করেন। একটা কেলেঙ্কারি তো আর ঘটানো যায় না। পরনে ভালো পোশাক চাই। এতে আমার প্রতি সবার শ্রদ্ধাভাব আসবে ; সমাজের চোখে তখন আমি ওঁদের সমকক্ষ হয়ে যাব।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে কিছু বেতন আগাম তুলে নিলাম। চারকিনস্ থেকে কিনে আনলাম একজোড়া কালো দস্তানা আর চমৎকার টুপি। নিজেকে বোঝালাম, 'রঙের ব্যাপারটা ফেলনা নয়, ওটাও মনে রাখা চাই। একটা ভালো, সাদা চেকওলা শার্ট আগেই যোগাড় করে রেখেছিলাম। বেকায়দায় ফেলল ওভারকোটটা। কোটটা বেশ ভালো আর গরম কিন্তু কলারটা অতি জঘন্যরকমের ক্যাটকেটে। যে-কোনো মূল্যে কলারটা বদলানো চাই। চাই একটা নতুন জার্মান বীভার—ওই অফিসাররা যেমন পরে। শুরু হল বাজারে ঘোরাঘুরি। বেশ কয়েকদফা চেষ্টার পর একটা সস্তা বীভার কিনতে পেলাম। পরলাম। কদিনের মধ্যেই পুরোনো হয়ে যাবে জানি, তবু নতুন অবস্থায় প্রতিপক্ষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট সেটা। আর আমার তো দরকার শুধু একদিনের জন্য। দামটা খুবই বেশি। কী করা যায়? ঠিক করলাম, পুরোনো কলারটা বেচে দেব। তাতেও হল না। আরও কিছু টাকা ধার করতে হল আন্তন আন্তনিচ সিওতোচকিনের কাছ থেকে। সিওতোচকিন আমার ইমিডিয়েট উপরওলা—নির্বিকার ধরনের মানুষ ; গম্ভীর, কিন্তু বিবেচনাবান। আমি কাউকে টাকা ধার দিই না। আন্তন আন্তনিচের কাছ থেকে ধার করতে বাধ্য হওয়াটা ভয়ঙ্কর লাগল। লজ্জাও পেলাম। পরপর দু-তিন রাত ঘুমোতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি ওইসময় আমার ঘুম কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। জ্বরজ্বর বোধ হত। বুকের ভিতর যেন কিসের কষ্ট! হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে ওঠে কখনও কখনও। আন্তন আন্তনিচ প্রথমে খুব বিস্মিত হল। তারপর ভুরু কোঁচকাল। টাকাটা অবশ্য দিয়ে দিল দেরি না করেই। তার আগে একটা মুচলেকায় আমার সই আদায় করে নিল। পনের দিনের মধ্যে আমার বেতনের টাকা থেকে ধারের টাকা কেটে নিতে পারবেন তিনি।

এইভাবে শেষ পর্যন্ত সব প্রস্তুতি সারা হল। ধীরে ধীরে শুরু হল আমার আসল কাজ। খাপছাড়াভাবে কিছু করা যাবে না, সব সারতে হবে দক্ষতার সঙ্গে,

ক্রমানুসারে। কিন্তু স্বীকার করছি, এত প্রচেষ্টার পরও হতাশ হতে হচ্ছিল আমাকে। কোনোক্রমেই পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চলবে না। খুব সাবধানে এগোচ্ছিলাম আমি। তবু কী যে হল। যেই দুজন কাছাকাছি এসে পড়েছি, অমনি একপাশে সরে গেলাম আর তিনি গট্‌গট্ করে হেঁটে চলে গেলেন, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম তিনি যেন আমার মনোবল অটুট রাখেন। আবার চেষ্টা করলাম। শেষ সুযোগ। যখন আমাদের মধ্যে মাত্র ছ-ইঞ্চি ব্যবধান তখন আমার সব মনোবল ভেঙে পড়ল। হোঁচট খেয়ে তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম। তিনি আমার শরীর মাড়িয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গেলেন, আর আমি বলের মতো গড়িয়ে পড়লাম একপাশে। সেই রাতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। জ্বর এসে গেল কাঁপুনি দিয়ে।

এই পরপরই অবশ্য হঠাৎ ঘটনাটার ইতি ঘটল আনন্দের সঙ্গে। যেদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই মারাত্মক খেলাটার মধ্যে আর যাব না, সেদিন বিকেলে শেষবারের মতো গেছি নেভস্কিতে। সহসা তিন-কদম দূরত্বের মধ্যেই আমি আমার শত্রুকে পেয়ে গেলাম। অপ্রত্যাশিতভাবেই তৈরি হলাম মনে মনে। চোখ বন্ধ করে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমার খুব কাছ দিয়েই হাঁটছেন। পাশাপাশি, প্রায় পায়ে পা মিলিয়ে আমিও হাঁটছি। আমাদের কাঁধে কাঁধে ঘষা লাগেছে। কিন্তু হল কি, তিনি আমাকে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। নিশ্চিত বলতে পারি, তিনি ভান করছিলেন। তিনি নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয় ; আসল ব্যাপার এই যে আমি প্রতিশোধ নিয়ে ফেললাম। আমি আমার মর্যাদা সমুন্নত রেখেছি। একইঞ্চিও নড়িনি নিজের জায়গা থেকে। সবার সামনে সমান তালে তাঁর পাশাপাশি হেঁটেছি। শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছি—এই আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি। কী যে খুশি হয়েছি! বিজয়ের আনন্দে ইতালীয় লোকগীতি গাইতে শুরু করেছি। অবশ্য এর ঠিক তিনদিন পরে কী ঘটেছিল, সে-কথা আর বলতে চাই না। যদি এ-কাহিনীর প্রথম অধ্যায় পড়ে থাকেন, তো নিজেই সব বুঝতে পারবেন। অফিসারটি পরে বদলি হয়ে যান। তারপর চৌদ্দ বছরে কেটেছে, তাঁকে আর দেখি নি। মানিকচাঁদ কী করছেন এখন? কাকে পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন?

দুই

তো...একদিন এইসব হেলাখেলার দিনগুলো শেষ হলে পরের দিনগুলোতে কী যে হত, শরীর একটুও ভালো থাকত না। তারপর আসত অনুশোচনা। শরীরটা আরও খারাপ হয়ে যেত। আমি এগুলোকে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইতাম, তাতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়তাম। ক্রমে ক্রমে অবশ্য এইসব অসুস্থতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে

নিলাম। সবকিছুই সহ্য হয়ে এল ; কিংবা বলা চলে, নিজেই সব সহ্য করে নিতে শিখলাম। আমার পালানোর একটা পথ ছিল ; নিজেকে সব সময় ডুবিয়ে রাখতাম যা কিছু কল্যাণ আর সুন্দর সেইসব স্বপ্নের ভিতর। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে পারি আমি। একটানা তিনমাস স্বপ্নের ভিতর বসবাস করতে পারি। বিশ্বাস করুন। ভাই, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সেই জার্মান পশমি দস্তানাওলা লোকটার স্মৃতিও আমাকে বিব্রত করতে পারে নি। সহসা আমি এক বীরপুরুষ হয়ে উঠেছিলাম। সেই ছ-ফুট লম্বা লেফটেন্যান্টটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেও তখন হয়তো আমি তাকে পাত্তা দিতাম না। এমনই বীরপুরুষ হয়ে উঠেছিলাম সে সময়। কী স্বপ্ন দেখতাম আর কীভাবে সেসব স্বপ্ন আমাকে সুখ দিত, এখন বলতে পারব না। কিন্তু তখন সেগুলো সত্যি আনন্দদায়ক ছিল, আমি স্বীকার করতে বাধ্য। আর এখনও সে-স্বপ্ন যে আমার ভিতর পুলক সঞ্চার করে না, তা বলা কঠিন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখস্বপ্ন—তবু সে যে কী মধুর, কী একটা ব্যাপার! স্বপ্ন ভেঙে গেলে আসত অনুশোচনা, আসত অশ্রু। আসত অকারণ নিজের ওপর অভিসম্পাত আর নিঃসঙ্গতাবোধ। এক ধরনের উন্মত্ততায় আমাকে পেয়ে বসত—তার কিছুটা সুখের, কিছুটা যন্ত্রণার। তার কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা আশা আর ভালোবাসা। মনে হত, এইসব দুঃখের দিন একসময় হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে। জীবন ভরে উঠবে হঠাৎ নতুন পাওয়ার আনন্দে। আসবে শুভ, আসবে কল্যাণ। নতুন কাজের ভিড়ে নিজেকে আবিষ্কার করব। কী কাজ, কেমন সে আনন্দ, জানি না। শুধু জানি নতুন আলোর ইশারায় আমার জীবন নতুন চলার গতি পাবে—চঞ্চল অশ্বক্ষুরের ধুলায় ভরে যাবে চারদিক। এই আশায় নিজের ছোট্ট চৌহদ্দির ভিতর আত্মমগ্ন হয়ে থাকতাম। বাইরে কোথাও বিশেষ যেতাম না। যখন কাদায় চলা আটকে যেত, তখন ভাবতাম, এ তো বীরের পরিণতি। জীবনযাত্রায় যে বড় বীরপুরুষ, কাদায় আটকে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা তো তাকেই মানায়। এরই মধ্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসত অনিবার্য অবধারিত কল্যাণ আর আনন্দের ঝলকানির মতো স্বপ্নের ঝাঁক। খাবারের মধ্যে চাটনি যেমন লাগে, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এই স্বপ্নগুলোও তেমনি। গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে এর মধ্যেও জীবনের অনেক সার-সত্য লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, আমি তো এক খুদে কেরানির জীবনের সহজ অশ্লীল প্রত্যক্ষ অজাচারের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিই নি ; এ-জীবনের সমস্ত পঙ্কিলতার মধ্যে থেকেও না। তবে আর কিসের লোভে, কোন্ মায়ায় মাঝরাতে ঘর ছেড়ে বেপথু হব? না, এই সর্বনাশ থেকে আত্মরক্ষার অনেক আকর্ষক পথ আমার চেনা।

আর সময় সময় সেইসব স্বপ্নের মধ্যে মনে কী যে ভালোবাসাপূর্ণ মমতার অনুভূতি জাগত! ইয়াল্লাহ! বিশেষ করে সেইসব মুহূর্তে, যখন কল্যাণ আর সুন্দরের রাজত্বে উড়াল দিতাম, হারিয়ে যেতাম। সে ছিল কল্পলোকের আকাশ-কুসুম ভালোবাসা, বাস্তব জীবনে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তবু তাতে

এমনই মাধুরী মিশে থাকে যে বাস্তব জীবনে তার অস্তিত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কারণ তা শুধু বাড়াবাড়িরই শামিল হবে। অপার্থিব প্রেমের মুহূর্ত সেসব! জীবনের বাস্তব প্রেমের বেলায়ও কি অতখানি আনন্দানুভূতি জাগে? কে জানে! এইসব অনুভূতির বেশির ভাগই কিন্তু পাঠকচিত্তজয়ী সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকে আসত। সব কবি আর ঔপন্যাসিকদের রচনা থেকে আত্মসাৎ করে প্রয়োজনমতো নতুন নতুন সৃষ্টির দিগন্ত তৈরি করলাম নিজের মনে, নিজের স্বপ্নের গভীরে। নিজেকে সহসা অনেক বড় মনে হত মনে হত, আমি ওদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছি। হঠাৎ যেন 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'—এমনি অবস্থা। আমি তো নিজেও কবি ছিলাম, ছিলাম একজন ভালোমানুষ। প্রেমে পড়েছিলাম। মনে হত আমি যেন কোনো প্রেরিত পুরুষ—কোটি জনতার স্বার্থে উৎসর্গিত প্রাণ। তাদেরকে মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ করাই আমার কাজ। দৈব কাহিনীর সেইসব 'কল্যাণ আর সুন্দর' প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে সবার সামনে অপকীর্তির জন্য স্বীকারোক্তি করেছি। সবাই আমাকে চুম্বন করেছে আর কেঁদেছে (যারা করে নি তারা কী দুর্ভাগা!) আমি স্থির লক্ষ্য সামনে নিয়ে নগ্নপদে হাঁটি, আর মানুষকে নতুন বাণী শোনাই। তারপর সমবেত বাদ্য বেজে ওঠে, গম্ভীর নিনাদে ক্ষমা ঘোষণা হয়। পোপ রোম ছেড়ে ব্রাজিলে গিয়ে অবসর নিতে সম্মত হন। তারপর কোমো হ্রদের তীরে ভিলা বার্জিসে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল এক ভোজসভা। গোটা ইতালির আমন্ত্রণ সেখানে। শুধু ওই উৎসবের প্রয়োজনেই ভিলা বার্জিসের অবস্থান দেখানো হয়েছে কোনো হ্রদের তীরে। আর ওই একই কারণে তাকে রোমের কাছাকাছি স্থানান্তর করা হয়। তারপর অবশ্য কল্পনার সেই সব দৃশ্য ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু সবাই তো জানেন, কী থেকে কী হয়। হাটে নিজের সব হাঁড়ি ভাঙা নিশ্চয় কিছু কাজের কথা নয়! কী লাভ নিজের অশ্রু আর হাহাকার অন্যের সামনে তুলে ধরে? শেষে সেই ঝোপের দৃশ্যের অবতারণা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনারা এবার চড়াও হতে পারেন আমার ওপর। বলতে পারেন, এটা অশ্লীল ; স্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা। কিন্তু কেন, বলুন তো! জানেনই তো, আমি এই সবকিছুর জন্য ক্ষমা চেয়েছি। এরচেয়ে বড় কোনো বোকামি কি জীবনে আর হয়? সবই তো স্রেফ কল্পনা—যেখানে সবই সম্ভব। লেক কোমোর তীরে এর সবই ঘটে নি। তবু আপনার কথাই ঠিক। এগুলো অশোভন এবং ধর্মদ্রোহিতা। তার চেয়ে বড় ধর্মদ্রোহিতার কাজ এই যে নিজের হয়ে সাফাই গাইছি আপনাদের কাছে। আরও বড় ধর্মদ্রোহিতা হচ্ছে এইসব মন্তব্য। কিন্তু না, ভাই, এ পর্যন্তই থাক। কারণ এর তো কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। এরপর পদে পদে যা বলব, তাই হবে ঘোরতর ধর্মদ্রোহিতা...

মুশকিলের ব্যাপার কী, জানেন? একটানা তিনমাসের মতো স্বপ্ন দেখেই আমাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল, কারণ এর পরপরই সমাজের গভীরে প্রবিষ্ট হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আমাকে পাগল করে তোলে। সমাজের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়া

মানে ধরুন আমার অফিসের উপরওলা আন্তন আন্তনিচের সঙ্গে দেখা করা। সারাজীবনে সেই আমার একমাত্র স্থায়ী সঙ্গী। কী করে তা হওয়া সম্ভব হল তা এখনও আমার কাছে পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু কখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা দেখা করতে যেতাম? ঠিক যখন আমার স্বপ্ন তিনমাস পেরিয়ে নির্দিষ্ট শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে। যখন আমার মনে হয়েছে এবার সরাসরি মানবসমাজের মুখোমুখি হওয়া দরকার। আমাকে অবশ্য প্রত্যেক মঙ্গলবারে আন্তন আন্তনিচের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হত। মঙ্গলবার ছিল তাঁর ছুটির দিন। তাই মানবসভ্যতার মখোমুখি হবার জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম মঙ্গলবার। আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি এই দিনটির অপেক্ষায় থাকতাম।

ফাইব করনারস-এর একটি বাড়ির চারতলায় থাকতেন আন্তন আন্তনিচ। ছোট ছোট, খুপরি ধরনের চার কামরার বাসা। সেই বাসায় থাকতেন তাঁর চাচি, আর দুই মেয়ে—আমার জন্য তারা চা বানিয়ে দিত। একটি মেয়ের বয়স তের, অপরটির চোদ্দ। দুজনেরই নাক চ্যাপটা, মোটা। ওদের দেখে সবসময় সঙ্কুচিত হয়ে পড়তাম। কারণ যখনই ওদের দিকে তাকাতাম, দেখতাম, ওরা কানাকানি করছে আর হি-হি করে হাসছে। বাড়ির কর্তাকে সাধারণত দেখা যেত বসে আছেন বৈঠকখানায় ; টেবিলের সামনে চামড়ার কৌচে বসে আড্ডা দিচ্ছেন কয়েকজন পাকা চুলওলা, ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁদের বেশির ভাগই আমাদের অফিসের সহকর্মী। সব সময় এদেরই দেখতাম, অন্য কাউকে বিশেষ চোখে পড়ে নি কখনও। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুল্ক-আবগারি, ব্যবসাপাতি, সিনেট, বেতন, প্রমোশন, বড় হুজুর ; আর কীভাবে তাঁকে সবচেয়ে খুশি করা যায়, এইসব। সেইসব মানুষের সামনে বোকার মতো চারঘণ্টা একটানা বসে থাকতাম ধৈর্যসহকারে। কী বলব ভেবে না পেয়ে তাদের কথা শুনতাম। নিজেকে নিতান্ত নির্বোধ মনে হত। মাঝে মাঝে বুঝতে পারতাম, বিষম ঘামছি, শরীরটা অবশ লাগত। কিন্তু তারপরও বেশ উপভোগ করতাম ব্যাপারটা। বাসায় ফিরে মনে হত পৃথিবীর সব মানুষের সঙ্গেই সাক্ষাৎ সারা হয়েছে আমার।

আরও একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিল অবশ্য, তার নাম সিমোনভ। খুব ছেলেবেলায় স্কুলে পড়তাম একসঙ্গে। পিটার্সবুর্গে অনেক সহপাঠী ছিল আমার। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে আমি কখনো যোগাযোগ রাখি নি। এমনকি পথে দেখা হলেও অভিবাদন করতাম না—এমনি অবস্থা। ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে আমার অনেক ঘৃণা জড়িয়ে আছে। হয়তো সেই কারণে নিজেকে সবার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখতাম। ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত বদল করেছিলাম—হয়তো কেবলমাত্র ওদের সংস্রব এড়ানো আর আমার অভিশপ্ত শৈশবের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যেই। চুলোয় যাক ওই স্কুল আর আমার সেই কারাদণ্ডের বছরগুলো। দু-তিনজন সহপাঠীর কথা আলাদা, পথে দেখা হলে যাদের আমি চিনতাম, মাথা নোয়াতাম, তাদেরই একজন সিমোনভ। স্কুলে সে চোখে পড়ার মতো কেউ ছিল না। আচরণে

ছিল শান্তশিষ্ট, নিরীহ ধরনের। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর চারিত্রিক দৃঢ়তার বিচারে তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলাম আমি। সে বোকা ছিল এ কথা কখনও আমার মনে হয় নি। তার সঙ্গে বেশ কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটিয়েছি আমি। কিন্তু সে বেশিদিনের জন্য নয়। কীভাবে যেন সেই সম্পর্কে চিড় ধরে যায়। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দেখি ওর প্রশ্নটা রীতিমতো বিড়ম্বনার। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, ও বোধ হয় আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। তবু নিশ্চিত হতে না-পেরে ভাবতাম, একদিন ওর সঙ্গে দেখা করব।

তো এমন অবস্থায় একদিন নিঃসঙ্গতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, বিশেষ করে যখন দেখলাম দিনটা বৃহস্পতিবার, আন্তন আন্তনিচের দরজা বন্ধ—ঠিক করলাম সিমোনভের ওখানে যাব। তার চারতলার বাড়ির তার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় মনে হল নাহ, ভুল হচ্ছে যাওয়াটা। লোকটা আমাকে খুবই অপছন্দ করে। তবু কিসের যেন তাড়নায়, নিজেকে একটা ভুল জায়গায় দেখার আকাঙ্ক্ষাতেই হয়তো—আমি ওর বাসার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। শেষবারের মতো সিমোনভের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাও প্রায় বছরখানেক হল।

তিন

ওর বাসায় ঢুকে দেখলাম স্কুল জীবনের দুই বন্ধু তার কাছে বসে আছে। মনে হল কোনো জরুরি বিষয়ে আলাপ করছে। কেউই আমার দিকে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করল না। খুবই তাজ্জব ব্যাপার। বছরে পর বছর ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। শেষে তারা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন মাছি দেখছে। যতই অপছন্দ করুক, স্কুল জীবনেও কেউ আমার সঙ্গে এমন আচরণ করে নি। জানি, আমাকে এখন উপেক্ষা করা অযৌক্তিক নয়। চাকরিতে উন্নতি করতে পারি নি, বেহাল অবস্থা। কাপড়চোপড়ের অবস্থা এত খারাপ যে বোঝাই যায়, আমার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু তারপরও এতটা অবহেলার মুখোমুখি হব, ভাবি নি। সিমোনভ তো আমাকে ঢুকতে দেখে খুবই অবাক। আগে, স্কুলজীবনেও আমাকে দেখে সে এইরকম অবাক হত। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসে ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

আলোচনার বিষয়বস্তু : তাদের কমরেড জেভারকভের বিদায়-সংবর্ধনা। সেনাবাহিনীর ওই অফিসারটি দূরের কোনো শহরে বদলি হয়ে যাচ্ছে। পরের দিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই জেভারকভও স্কুলে বরাবর আমার সঙ্গে পড়েছে। তাকে আমি পছন্দ করতাম না—বিশেষত তার বাহ্যিক আচার-আচরণের জন্য। কিন্তু মনে মনে সে খুবই সুন্দর, মিশুক, আড্ডাবাজ ছেলে, সবারই ভালো লাগবে—এমন। আমি অবশ্য তার ওই দিকগুলোও পছন্দ করতাম না। লেখাপড়ায়

সে খুবই খারাপ ছিল ; দিনদিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, স্কুল সে শেষ করল ভালো সার্টিফিকেট নিয়েই, কারণ তার ক্ষমতার অভাব ছিল না। ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময় পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পেল। বিশাল জমিজমা ; শ–দুয়েক ভূমিদাস। ক্লাসের আমরা অন্য সবাই ছিলাম গরিব–ঘরের। ফলে সে বড়ই তাচ্ছিল্যের সুরে আমাদের সঙ্গে কথা বলত। কথায়–কথায় মুখ খারাপ করত। কিন্তু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেও মনটা তার ভালোই ছিল। আর যতই অপমানিত হই, হাতে–গোনা দু–চারজন বাদে আমাদের বাকি সবাই কাঁচুমাচু হয়ে থাকত জেভারকভের সামনে। সে যতই ডাঁট নিত, বন্ধুদের কাঁচুমাচু ভাবটাও তত বেড়ে যেত। সে যে ওদেরকে কিছু দিত, তা নয়। তবু বন্ধুদের সেই নতমুখী আচরণের কী কারণ? হয়তো তার সৌভাগ্যের প্রতি সম্মান, কে জানে! শুধু প্রকৃতির বরমাল্যই নয়, জেভারকভের গর্ব করার মতো আরও কয়েকটা জিনিস ছিল। সামাজিক কায়দা–কানুনের ব্যাপারে সে সব সময় চৌকস ; অনেক জানত বুঝত। কিন্তু মুশকিল হল, ওর এই গুণের জন্যই আমি ওর ওপর হাড়ে–হাড়ে চটে থাকতাম। আরও কারণ ছিল। ওই যে খামোকা ডাঁট–ফাট নেয়া, অন্য কাউকে মানুষ বলে গণ্য না–করা, নিজের প্রতিভা আর বুদ্ধির প্রশংসা আর অহঙ্কারে ডগমগ করা— এইসব আসলে নিরেট মূর্খতা। কথাবার্তায় সে খুবই চটপটে, ঠাট–বাট সেই চল্লিশের দশকের সামরিক কেতার মতো—অবাধ, দুর্বিনীত, অনায়াস—কিন্তু তার মুখটা দেখাত নির্বোধের মতো। (প্রায়ই মনে হত, ওই মুখের জায়গায় নিজের মুখটা বসিয়ে দিই।) তা ছাড়া ভবিষ্যতে মেয়েদের পটাবার কথা সে যে–ভঙ্গিতে বলত, সেটাও আমার খুব খারাপ লাগত। (সেনাবাহিনীর ব্যাজ কাঁধে ঝোলাবার আগে সে অবশ্য মেয়েদের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস করে উঠতে পারে নি, পরম অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে।) আমি আড্ডাবাজ ছিলাম না খামোকা বকবকানি আমার ভালো লাগে না। তবু জেভারকভের ব্যাপারে হঠাৎ যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তার পেছনে একটাই ঘটনা ছিল, মনে আছে। একদিন সে দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করল, তার জমিদারির এলাকায় একটি মেয়েকেও সে না দেখে ছাড়বে না। যদি কেউ বাধা দেয় সে তাকে ভোগাবে। খাজনা দ্বিগুণ করে দেবে। যাবে কোথায় ওই দাড়িওয়ালা ভূতগুলো? সে তার ভবিষ্যৎ নারী–সংসর্গের পরিকল্পনাও ব্যক্ত করছিল বন্ধুদের কাছে। সে খুব ভালো খেলোয়াড় হবে—কুকুরছানা যেভাবে রোদে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে খেলে আর কি। তার জি–হুজুর মার্কা পা–চাটার দল তো মারহাবা মারহাবা করে উঠল। কিন্তু আমি ধরে বসলাম। মেয়েদের প্রতি দরদ কিংবা তাদের বাপেদের প্রতি সহানুভূতির জন্য নয়। এইজন্য যে একটা নোংরা চিন্তাচেতনাসম্পন্ন ছেলের প্রশংসায় অন্যেরা গলে পড়ছে। ওই মুহূর্তে অবশ্যি আমারই জয় হল ; কিন্তু জেভারকভ তো কিছু কম সেয়ানা নয়! সে পরাজয় বুঝেও আমার আক্রমণ হেসে উড়িয়ে দিল। এতে আমার বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে গেল। পরে সুযোগমতো সে আমাকে একহাত নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেই একই

ধূর্ততার সঙ্গে—কোনো বিদ্বেষ না দেখিয়ে, কেবলই যত্ন করছে—এমনভাবে। আমি রাগে ফেটে পড়লেও নীরব থেকেছি ; ওর কথার উত্তর দিই নি। স্কুল ছাড়ার পর সে দু-একবার আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার ভান করেছে, কিন্তু আমি তার সঙ্গে মেশার আগ্রহ দেখাই নি। বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের মেলামেশা। পরে শুনেছি, সেনাবাহিনীতে তার পদোন্নতি হয়েছে। লেফটেন্যান্ট হয়েছে সে। বেপরোয়া জীবন যাপন করছে। বেশ কিছু গুজবও কানে এল। এরপর রাস্তায় দেখা হয়েছে, কিন্তু আমার মতো তুচ্ছ মানুষের কথা মনে আছে, এটা প্রমাণ করে সে নিজেকে খাটো করতে চায় নি। আরও একবার তাকে দেখলাম সিনেমা হলে। এক বুড়ো জেনারেলের মেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। তিন বছরের মধ্যে তার চেহারায় বেশ খানিকটা অবনতি হয়েছে। যে-কেউ বলতে পারবে, ত্রিশ বছরে পৌঁছে সে ধুমসো হয়ে যাবে। তবু এখনও সে সুদর্শন, চটপটে। তো এই হচ্ছে সেই জেভারকভ—যার বিদায়ে আমার স্কুলের সহপাঠীরা ভোজের আয়োজন করছে। গত তিন বছর ওর সঙ্গে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। যদিও নিশ্চিত জানি, তারা কখনই নিজেদেরকে জেভারকভের সমকক্ষ বলে ভাবতে পারে নি।

সিমোনভের দুজন অতিথির মধ্যে একজন হচ্ছে ফারফিচকিন—আদিতে জার্মান, পরে রুশ হয়ে গেছে। বাঁদরমুখো ছোটখাটো গোবর গণেশ ধরনের মানুষ। সব সময় অন্যকে উপহাস করছে। অতি ছেলেবেলা থেকে লোকটা আমার ঘোর শত্রু। বেয়াদব, মুখ-আলগা, ফাজিল—অথচ তার ষোলআনা দাবি, সবাই তাকে মান-সম্মান করুক। মনে মনে কিন্তু সে অতি বড় কাপুরুষ। জেভারকভের পা-চাটা দলের শীর্ষে সে ; সব সময় ধান্দা নিয়ে ঘোরে। বেশ কয়েকবার জেভারকভের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার করেছে। সিমোনভের অপর অতিথি ক্রুদোলিউবভ সম্পর্কে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু নেই ; লম্বা, একহারা চেহারা ; সেনাবাহিনীতে চাকরি করে ; নিরুত্তাপ মুখ ; অতি সজ্জন ; যে-কোনো সাফল্যের স্তুতিতে অকৃপণ। জীবনে তার একটিমাত্র বিষয়েই চিন্তার ক্ষমতা আছে—সেটা হচ্ছে প্রমোশন। জেভারকভের সঙ্গে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে তার। অদ্ভুত ব্যাপার, শুধু এই কারণেই আমার বন্ধুমহলে সে বেশ কেউকেটা।. আমাকে পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে করে না, কিন্তু কোনো ঝামেলাও করে না মোটকথা তার সঙ্গটা সহনীয়।

শুনলাম ক্রুদোলিউবভ বলছে, ‘তাহলে ওই কথা, সবাই সাত রুবল করে, তিনজনে মিলে দিচ্ছি একুশ রুবল। খাসা ডিনার হয়ে যাবে। জেভারকভের কাছ থেকে তো আর নেয়া যায় না...।’

সিমোনভ দৃঢ় স্বরে বলল, ‘মোটেই না, যখন আমরাই নেমন্তন্ন করছি।’

‘কী যে ভাবো !’ ফারফিচকিন ঝাঁজালো স্বরে দেমাগ দেখাল, যেন তার জেনারেলকে দারুণ অসম্মান করা হয়েছে, ‘কী যে ভাবো তোমরা ! জেভারকভ কি শুধু আমাদের খরচা করতে দেবে? ভদ্রতার খাতিরে যদি দেয়ও, তবু ধরে নিতে

পারো, অন্তত ছ-বোতল শ্যাম্পেনের অর্ডার তো সে দেবেই।'

'আমাদের চারজনের জন্যে ছ-বোতল?' মাত্র ছ-বোতলের কথা হচ্ছে লক্ষ করে খানিক নিরাশার সুরে বলল ক্রুদোলিউবভ।

সিমোনভের দায়িত্ব সব আয়োজন সম্পন্ন করার। সে রায় দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'তা হলে শেষ কথা হচ্ছে... আমরা তিনজন, জেভারকভকে নিয়ে চারজন মোট একুশ রুবল ... কাল পাঁচটার সময়, হোটেল ডি-প্যারিসে।'

আমি একটু চাপা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠলাম, 'একুশ রুবল কেন? আমাকে যদি ধরো, তাহলে তো একুশ রুবল না, আটাশ রুবল হবে।'

মনে হয়েছিল, নিজের থেকে এরকম হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নিমন্ত্রণে অংশ নেয়াতে ওরা আমাকে খাতির করবে, একটুখানি পরাজয়ও হবে ওদের, এবং সব মিলিয়ে একটা দারুণ ব্যাপার হয়ে যাবে।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সিমোনভ আমার দিকে আড়চোখে তাকাল, আসলে না তাকানোরই চেষ্টা করল যেন। আমার নাড়ি-নক্ষত্র জানে সে। 'তা তুমিও আসতে চাও নাকি?'

গা জ্বলে গেল আমার। 'যাব না মানে! আমিও তো তার সহপাঠী ছিলাম। তোমরা আমাকে বাদ দিতে চাও, খুব খারাপ কথা।'

ফারফিচকিন রুক্ষ স্বরে বলল, 'তোমাকে আবার কোথায় খুঁজে বেড়াব?'

'তোমার সঙ্গে তো আবার জেভারকভের ভাবসাব ছিল না কখনও', ক্রুদোলিউবভ ভ্রূকুটি করে বলল।

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। যাবই।

খানিকটা রুষ্ট, কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে মতামত দেবার অধিকার কারুর নেই। ওর সঙ্গে বিশেষ খাতির ছিল না—ঠিক এই কারণেই এখন যেতে চাই।'

ক্রুদোলিউবভ পরিহাস-তরল স্বরে বলল, 'তা যখন এমন করে বলছ, তোমাকে আর বাদ দিই কী করে?'

সিমোনভ তখন আমার দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি বলল, 'তুমিও যাবে। কাল বিকেল পাঁচটায়; হোটেল ডি-প্যারিসে।'

'টাকাটার কী হবে?' ফারফিচকিন আমার দিকে ইঙ্গিত করে সিমোনভের উদ্দেশে নিচু গলায় বলতে শুরু করল। কিন্তু কেন যেন মাঝপথেই ইতি দিল। সিমোনভকেও খানিকটা বিব্রত দেখাচ্ছে।

'ওই তো হল', উঠে পড়ে ক্রুদোলিউবভ, 'ও যখন অত করে বলছে, আসুক না।'

ফারফিচকিন তবু তর্ক ছাড়তে চায় না। 'কিন্তু এটা তো আমাদের কয়েকজন বন্ধুর মানে নিজেদের ব্যাপার আর অফিসের কোনো সমাবেশ তো আর নয়।'

'না, সে-রকম কোনো ইচ্ছে আমাদের কারুর নেই...'

চলে গেল তারা। ফারফিচকিন যাবার সময় আমার দিকে তাকাল না। ক্রুদোলিউবভ সামান্য মাথা নাড়াল। সিমোনভ কেমন যেন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। বিরক্তিভরে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল।

'তা তাহ্লে কালকে। চাঁদাটা এখনই দিয়ে দেবে নাকি? মানে জানার জন্যে বলছিলাম আর কি!—জড়ানো বিব্রত স্বরে বিড়বিড় করে বলল সিমোনভ।

মুখ লাল হয়ে গেল আমার। তক্ষুনি মনে পড়ল, বহুদিন আগে আমি সিমোনভের কাছ থেকে পনের রুবল ধার নিয়েছিলাম। ভুলি নি, কিন্তু শোধও করি নি।

'দেখো, সিমোনভ, আমি আসলে জানতাম না তো ... এখানে আসার আগে ভাবিই নি আর মেজাজ খুবই খারাপ ছিল, ভুলে গিয়েছিলাম..

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাতে কী হয়েছে? কাল ডিনারের পরেই না হয় দিয়ো। আমি আসলে শুধু জানার জন্যেই ইয়ে কিছু মনে কোরো না আবার..

কথা শেষ না-করেই উঠে দাঁড়াল সিমোনভ, ভুরু কুঁচকে পায়চারি করতে শুরু করল মেঝের ওপর পা ঠুকতে ঠুকতে।

দু-মিনিট নীরব থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম, ' আমি কি তোমার দেরি করিয়ে দিচ্ছি?'

'অ্যাঁ? ' জড়ানো গলায় সে বলল, 'সত্যি বলতে কি কতকটা সে-রকমই। আমাকে ...একটু বেরুতে হবে, একজনের সঙ্গে দেখা করব.. বেশি দূরে নয়,.. ।' তার কথায় একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব লক্ষ করলাম।

'ইয়াল্লা! আগে বলবে তো!' চেঁচিয়ে উঠে টুপি হাতে তুলে নিই। একটা অভাবিত সহজিয়া সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি, যা পারব বলে নিজেও কখনও কল্পনা করি নি।

'বেশি দূরে নয়...এই কাছেই', আবার বলল সিমোনভ। আমার পাশাপাশি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। তার মুখে বেমানান অভিব্যক্তি। 'তাহলে কাল ঠিক ঠিক পাঁচটায় দেখা হচ্ছে', বলে সিঁড়ির নিচে এসে সে আমাকে বিদায় জানাল। আমাকে তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচে। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল আমার।

পথে হাঁটতে হাঁটতে আমি দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলাম রাগে। 'কিসের টানে, কিসের নেশায় ওই জেভারকভের মতো শয়তান, শুয়োরের সান্নিধ্যে যাচ্ছি? না গেলেই বা কী হয়। কলা দেখিয়ে কেটে পড়লেই বা কী ক্ষতি? দেব কাল সকালের ডাকে একটা চিঠি—সিমোনভকে জানিয়ে দেব, যাচ্ছি না, যেতে নিশ্চয় আমি বাধ্য নই। '

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি জানি, যেতে আমাকে হবেই। যতই বুঝতে পারছি, যাওয়া উচিত হচ্ছে না, বোকামি হয়ে যাচ্ছে , ততই নিশ্চিত হচ্ছি, আমি যাব।

যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা আমার টাকা নেই। মাত্র নয় রুবল সম্বল। তার থেকে অ্যাপোলন—মানে কাজের লোকটাকে দিতে হবে সাত রুবল। মাসে ওই কটা টাকাই আমি তাকে দিই। ওই টাকাতেই সে চালিয়ে নেয়।

তাকে বেতন না-দেয়া একেবারেই অসম্ভব। তার আবার যা মতিগতি! থাক, আমার সেই বিষফোড়ার কথা অন্য সময় হবে।

মোটকথা, বুঝতে পারলাম, ওর বেতন আপাতত দেয়া হচ্ছে না, বিদায় অভ্যর্থনায়ই যাচ্ছি আমি।

সে-রাতে অতি বীভৎস সব স্বপ্ন দেখলাম। সন্ধে থেকেই অবশ্য ছেলেবেলার নানা অপ্রীতিকর স্মৃতি আমাকে জ্বালাতন করছিল। কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না। আমার ছেলেবেলা কেটেছে দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের মাঝখানে। তারা আমাকে স্কুলে পাঠাত নিতান্ত দীনহীন বেশে। রাতদিন বকাঝকা করত। স্কুলে সারাক্ষণ নীরব থাকতাম অসহায় প্রাণীর মতো। সবার দিকে তাকাতাম অবিশ্বাস নিয়ে। অন্য ছেলেরা কেউ আমার মতো দুরবস্থার শিকার নয়, তারা আমার সঙ্গে আচরণ করত করুণা আর ক্ষমাহীন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। আমি সহ্য করতে পারতাম না। এই পরাজয় বিষম গ্লানিকর মনে হত। প্রথম থেকেই আমি তাদের ঘৃণা করেছি। নিজের অন্তর্মুখী, আহত ও বেমানান অভিমান নিয়ে দূরে সরে থেকেছি। তাদের রুক্ষতা আসলে ভীষণ কষ্ট দিত। আমাকে লক্ষ্য করে ব্যাধিগ্রস্তের মতো হাসত তারা। আমার রোগা-পটকা শরীরটা নিয়ে বিষম উপহাস করত। অথচ তাদের শরীরই বা কী এমন ছিল! দিন দিন বেড়ে চলেছে তাদের কুৎসিত আচরণ। দেখতে দেখতে তাদের মুখগুলোও হয়ে উঠেছে কুৎসিত। তাদের চিন্তাচেতনার ক্ষুদ্রতা, তাদের খেলাধুলা, আলাপ-আলোচনার অশ্লীলতা আমাকে স্তম্ভিত করত। 'কোনো ভালো বিষয়ে তাদের আগ্রহ নেই, কোনো সুন্দর ধারণার ধার ঘেঁষতে চায় না। সব সময় মনে হত, ছেলেগুলো আমার চেয়ে অনেক নিম্ন-রুচির। দয়া করে হুট করে বলে বসবেন না, আমি আকাশ-কুসুম কল্পনা নিয়ে থাকতাম, আর ওদের আচরণই ছিল সত্যিকার জীবন। তারা আসলে কিছুই বুঝত না, জানত না জীবন আসলে কী! ওদের ওপর এই কারণেই তীব্র রাগ হত। উলটে, বাস্তব ব্যাপারটা এই যে ওরাই বাস করত স্বপ্নের রাজ্যে ; ওই বয়সেই তারা শুরু করেছে বৈষয়িক সাফল্যের ধান্দা। ভাবত, তারা খুব সেয়ানা ; জীবনের সবকিছু বুঝে গিয়েছে। তাদের চারপাশে অবশ্য ওই ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি—যারা জীবনের সবকিছু বুঝে গিয়েছে। যারা জীবনে উন্নতির শর্টকাট পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ভেতরে যারা সাংঘাতিক দুর্নীতিবাজ। যৌবন স্বাভাবিকভাবে মানুষের মুখে যে স্বর্গীয়তা বা যে আকর্ষণীয়তা এনে দেয়, তাদের মধ্যে তাও যেন অনুপস্থিত। সব মিলিয়ে তাদের ভীষণ ঘৃণা করতাম আমি ; আর তারাও যে আমাকে একইরকম অপছন্দ করে—তা আর গোপন থাকত না। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার কখনও মনে হত না, আমার প্রতি ওদের ঘৃণা-ভাবটা

কাটানো দরকার ; উলটে মনে মনে চাইতাম, ওরা এভাবে হেনস্থা করতে থাক আমাকে। ওদের অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য অন্য পথ ধরলাম। পড়াশোনায় মন দিলাম গভীরভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে ফল ভালো করতে পারি, হতে পারি একেবারে সেরা ছাত্র।

এতে অবশ্য একটা কাজ হল। তারা ধীরে ধীরে টের পেল, এমন অনেক বই আমি পড়ে ফেলেছি যা ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে নেই, আর অন্য ছাত্ররা সেসব বইয়ের নামও শোনে নি। বিষয়টা নিয়ে তারা অসভ্য অশ্লীল সমালোচনা-পরিহাস করত ঠিকই, কিন্তু মনে মনে দমে যেত। বিশেষ করে যখন দেখল, শিক্ষকরাও আমাকে বেশ কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন। ধীরে ধীরে ঠাট্টা-উপহাস বন্ধ হল ; কিন্তু শত্রুতা মিটল না। বছরের পর বছর গড়াল। সহপাঠীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখার কম চেষ্টা করি নি ; কিন্তু কাজ হল না। কারুর সঙ্গেই আর বন্ধুত্ব টিকল না। একবার অবশ্য এক বন্ধু পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন মনে-মনে আমি ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছি। আমি চাইলাম তার ওপর সর্বগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করতে। চারপাশের সব মানুষ সম্পর্কে তাকে তিলে তিলে বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। তাকে বাধ্য করতে চেষ্টা করলাম সবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে। গভীর বন্ধুত্বের ইশারা দিয়ে তাকে কাবু করলাম। কাঁদালাম তাকে। সে বেচারা বন্ধুর জন্য খুবই উৎসর্গিত প্রাণ। কিন্তু চারপাশের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে যেই পুরোপুরি আমার বন্ধুত্বের কাছে আত্মনিবেদন করল, অমনি ঘৃণা করতে শুরু করলাম তাকে নিষ্ঠুরের মতো ফিরিয়ে দিলাম। যেন তাকে জয় করাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্য সবাইকে তো কিছু জয় করতে পারি নি। অথচ ওই ছেলেটি ছিল অন্য সবার থেকে আলাদা ; একেবারে অন্যরকম।

স্কুল জীবন শেষ করার পর আমার প্রথম কাজ হল সমস্ত অতীতকে পায়ের ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলা ; পুরোনো সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের ইতি ঘটানো আর তাই যদি হবে তবে এতদিন পর সব সত্ত্বেও কেন আমি কষ্ট স্বীকার করে সিমোনভের উদ্দেশ্যে ছুটছি।

পরদিন খুব সকালে প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে বিছানা থেকে উঠলাম। যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই যা ঘটার ঘটে যাবে। কেন যেন বিশ্বাস হতে লাগল, আজ একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটবে এবং আগাগোড়া বদলে দেবে আমার জীবন। রোজকার মতো অফিসে গেলাম , কিন্তু ছুটি হবার দু ঘন্টা আগেই সটকে পড়লাম প্রস্তুত হবার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা, দেরি করা যাবে না, আবার সবার আগেও গিয়ে পৌঁছানো চলবে না। অন্যেরা যেন না ভাবে অতি উল্লাসে আমি খাবি খাচ্ছি। কিন্তু ফ্যাঁকড়া তো এক-আধটা নয়।

অ্যাপোলন দুনিয়ার সব কাজ ফেলে দিনে অন্তত দুবার আমার জুতো পালিশ করে। তবু ওর নজর এড়িয়ে প্যাসেজ থেকে ব্রাশ চুরি করে এনে জুতোজোড়া আরো চকচকে করে তুললাম। গভীর নিষ্ঠায় পরীক্ষা করলাম কাপড়চোপড়ের

অবস্থা। মনে হতে লাগল, সব পুরোনো, জীর্ণ, সুতো-ওঠা দেখাচ্ছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে আমি বরাবরই একটু অগোছালো। একবার ভাবলাম, অফিসের ইউনিফর্ম পরে যাই। পরে বিবেচনা করে দেখলাম, নাহ্ ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে মস্ত হলদে দাগ পড়েছে ওতে। ওই এক দাগ আমার ব্যক্তিত্ব-মহিমার নব্বই পারসেন্ট ঘুচিয়ে দেবে। এরকম ভাবাটা ছেলেমানুষি, তবু ভাবনাটা এল। কিন্তু তারপর এই ভেবে প্রশান্তি লাভ করতে চেষ্টা করলাম যে, এবার একটা কাজের মতো কাজ করতে যাচ্ছি। আজেবাজে কথা ভেবে সময় নষ্ট করা এখন ঠিক নয়। ভাবতে চাই না, জেভারকভ 'বদমাইশটা' কেমন শীতলভাবে আমার দিকে তাকাবে কেমন নির্বোধ, পরিহাস তরল দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসবে গাধা ত্রুদোলিউবভ ; কেমন রুক্ষ অভদ্রভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে ফারফিচকিন--আর সবাই মিলে জেভারকভের সমর্থন আর প্রশ্রয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভাবতে চাই না, সিমোনভ কীভাবে নেবে ব্যাপারটা—কেমন তাচ্ছিল্য ফুটে উঠবে তার আচরণে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি আদৌ না যাই। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। না গেলেও তীব্র বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে হবে। তাছাড়া আমি সর্বান্তঃকরণে চাইছি ওই ইতর লোকগুলোকে দেখিয়ে দেব, আমি কিছু ফেলনা নই। তার চেয়ে বড় কথা, এই তীব্র কাপুরুষোচিত উন্মত্ততার মধ্যেও আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি আমি ওদের জয় করেছি, বিপলুভাবে প্রভাবিত করেছি, জয় হয়েছে আমার প্রতিভার, নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করেছি আমি। তারা জেভারকভের পাশ থেকে সরে আসছে। নত, লজ্জিত বদনে এককোনায় বসে আছে, সে আর তাকে ছিন্নভিন্ন করছি আমি। হয়তো তারপর আবার মিলন হবে আমাদের । স্থায়ী বন্ধুত্ব হবে। কিন্তু সবচেয়ে তিক্ত, সবচেয়ে বিব্রতকর সত্য এই যে, নিশ্চিত জানি, আমি এসব কিছুই চাই না। কাউকে জয় করার কাউকে ছিন্নভিন্ন করার ইচ্ছে আমার নেই। যদি সব সত্যিও হয় তবু আমার কিছু যায়-আসে না। আহা দিনটা যদি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত ! অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ; পাল্লা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকলাম এলোমেলো অন্ধকার নামছে জমাট, ঘন তুষারে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

অবশেষে আমার জীর্ণ ছোট ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। আমি টুপিটা তুলে নিলাম। অ্যাপোলনের দিকে তাকালাম না। বেচারা সারাদিন অপেক্ষা করে আছে, মাসের বেতনটা পাবার আশায়। কিন্তু ছেলেটা এতই বোকা যে মুখ ফুটে তা চাইতেও পারছে না। তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলাম দরজা খুলে। একটি ঝকঝকে স্লেজগাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। পকেটের শেষ রুবল খরচ করার জন্যে ডাঁটের সঙ্গে চলে এলাম হোটেল ডি-প্যারিসে।

চার

আগের দিনেই ঠিক করে রেখেছিলাম, সবার আগে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, আগে যাওয়া না-যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই অর্থহীন। গিয়ে দেখি, কেউ নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের বরাদ্দ কামরাটাও খুঁজে পেতে খুব ঝামেলা হল। টেবিল সাজানো হয় নি। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওয়েটারের কাছ থেকে জানালাম, ডিনারের সময় পাঁচটা নয়, ছটা। এরপর আর তাদের কিছু বলা যায় না। মাত্র পাঁচটা পঁচিশ বাজে। ডিনারের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে, আমাকে জানানো উচিত ছিল ওদের । খামোকা অন্যের কাছে আমি হেয় হলাম। চুপচাপ বসে রইলাম। ওয়েটাররা টেবিল সাজাতে লাগল। খুবই বিব্রত বোধ করছি। ছটার দিকে ওরা এল। ঘরে বাতি জ্বলছে, তবু মোমবাতি সঙ্গে এনেছে। আমাদের পরের কামরাগুলোতে অনেক খদ্দেরের ভিড়। হইচই, চেঁচামেচি হচ্ছে। কয়েকজন বিশ্রীগোছের মহিলাও দেখলাম। কে যেন ফরাসি ভাষায় অশ্লীল চিৎকার শুরু করল। সব মিলিয়ে দম বন্ধ হবার মতো পরিবেশ। কাঁটায় কাঁটায় ছটা বাজতেই ওরা এসে ঢুকল। আর এতক্ষণের বিরক্তি চেপে আমিও সোল্লাসে ওদের স্বাগত জানালাম।

সবার আগে আগে হাঁটছে জেভারকভ ; বোঝাই যাচ্ছে, সে দলনেতা। সবাই হাসছিল। আমাকে দেখেই হাসি থামাল। জেভারকভ বন্ধুত্ব আর ভারিক্কি চাল মিশিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করল—ঠিক যেভাবে জেনারেল তাঁর ছাউনি পরিদর্শনের সময় সৈনিকদের সঙ্গে হাত মেলান। ভেবেছিলাম শুরুতে এরকম হতেই পারে। এর পরই আবার আগের মতো হয়ে যাবে জেভারকভ। শুরু করবে সেই রঙ্গ-তামাশা, ইয়ারকি-ফাজলামি। আমি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু দেখলাম, জেভারকভ তার উঁচুপদের উপযুক্ত ভারিক্কি চাল ছাড়ল না। খুবই বিস্মিত হলাম। সে যদি আমার ওপর মাতব্বরি ফলিয়ে অপমান করত, মন্দ হত না। আমি কোনো-না-কোনো উপায় খুঁজে নিয়ে পালটা আঘাত করতে পারতাম। কিন্তু সে-রকম ইচ্ছে প্রকাশ না করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আমার তুলনায় অনেক উঁচুদরের মানুষ। এত উঁচু যে আমার পিঠে হাত চাপড়ানোর যোগ্যতা রাখে। ওর এই মনোভাব আমাকে বিষম ক্ষিপ্ত করে তুলল।

'তুমি আমাদের আসরে যোগ দিতে চেয়েছ শুনে খুব অবাক হয়েছি', ধীরে ধীরে কাটা-কাটা ভঙ্গিতে কথা শুরু করল জেভারকভ। অভ্যেসটা সে নতুন আয়ত্ত করেছে। 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তুমি তো আমাদের কাছ থেকে সব সময় পালিয়ে বেড়াও। এটা কিছু মোটেই ভালো না। আরে, লজ্জা কিসের? তুমি আমাদের যেমন সাংঘাতিক ধরনের মানুষ ভাবো, আসলে আমরা তেমন নই, বুঝেছ হে? যাকগে, তুমি যে নতুন করে আমাদের সঙ্গে মিশতে চাও, এতেই আমি খুশি।'

তারপর শাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, টুপি খুলে জানালার ওপর রাখল।

ক্রুদোলিউবভ জিজ্ঞেস করল, 'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ?'

'তুমি কাল যেমন বলেছিলে, ঠিক পাঁচটায় এসেছি।' উঁচুস্বরে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ক্রুদোলিউবভ সিমোনভকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যে সময় পরিবর্তন করেছি সেটা ওকে জানাও নি?'

'না। ভুলে গিয়েছিলাম', সিমোনভের কথায় দুঃখ বা অনুতাপ—কোনো লক্ষণই নেই।

'তাহলে পুরো একঘণ্টা বসে আছ? হায় হায় রে বেচারা।' অট্টহাস্য দিয়ে উঠল জেভারকভ, যেন ভারি মজার একটা কিছু ঘটেছে। কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করলে ছানাগুলো যেমন লাফিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে শুরু করে, তেমনি করে হাসতে লাগল ফারফিচকিন। আমার অবস্থা টের পেয়ে সেও খুব মজা পেয়েছে।

আমি ধমকে উঠলাম ফারফিচকিনকে লক্ষ্য করে, 'এতে মজার কী হয়েছে? দোষটা তো আমার নয়, অন্যের। আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করে নি। এটা এটা এটা আসলে গোলমেলে ব্যাপার।'

ক্রুদোলিউবভ আমার পক্ষ নেবার ভান করল। 'গোলমেলে না, এটা রীতিমতো অভদ্রতা নিষ্ঠুরতা। যদিও কেউ ইচ্ছে করে ঘটায় নি, কী বলো, সিমোনভ, অ্যাঁ?'

ফারফিচকিন মন্তব্য করল, 'আমার সঙ্গে যদি কেউ ওই চালাকি খাটাত, আমি একেবারে..'

জেভারকভ বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি তো কিছু একটা হালকা খাবারের অর্ডার দিলেই পারতে। অথবা আমাদের জন্যে অপেক্ষা না করে আগেই ডিনারের অর্ডার দিয়ে দিতে।'

আমি তিক্ত স্বরে বললাম, 'তোমাদের অনুমতি ছাড়া তা হয়তো পারতাম কিন্তু বসে ছিলাম সে তো শুধু...'

'বসো ভাইসব, বসো' সিমোনভ চেঁচিয়ে উঠল। 'ডিনার রেডি। তবে তার আগে শ্যাম্পেন আসবে। খুব শীত পড়েছে, তাই না?'

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'খুঁজতে গিয়ে দেখি তোমার ঠিকানাটাই আমার কাছে নেই। কী করে চিঠি পাঠাই বল?'

গোলটেবিল ঘিরে সবাই বসল। আমিও বসলাম। ক্রুদোলিউবভ আমার বামে, ডানদিকে সিমোনভ। জেভারকভ বসেছে আমার বিপরীত দিকে, তার পাশে ফারফিচকিন।

'এবার বলো, তুমি যেন কোন্ সরকারি অফিসে আছ?' আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল জেভারকভ, কতকটা বিব্রত ভাব কাটিয়ে আমাকে খুশি করার জন্য।

ভাবলাম ওর মাথায় বোতল ছুড়ে মারব নাকি? ও কি তাই চায়? নতুন

আসরে স্বাভাবিকভাবেই রাগ দমানোর চেষ্টা করছি আমি। প্লেটের দিকে চোখ রেখে সংক্ষেপে অফিসের নাম বললাম।

'তা ..কেমন টোপ পেয়েছ? মানে আগের চাকরিটা ছাড়লে কেন?'

'আগের চাকরিটা ছাড়তে চাইলাম, তাই ছেড়ে দিলাম', জেভারকভের মতো করেই ভারিক্কি চালে উত্তর দিলাম। ফারফিচকিন উঠে বাথরুমের দিকে এগোল। সিমোনভ ট্যারচা চোখে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

ক্রুদোলিউবভ খাওয়া বন্ধ করে আমাকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

জেভারকভ চোখ টিপল, কিন্তু পাত্তা দিল না ব্যাপারটা।

'তা...পারিশ্রমিক কত পাও?'

'পারিশ্রমিক মানে!'

'মানে বেতন আর কি!'

বলতে চেয়েছিলাম, 'জেরা করছ কেন?' তার বদলে মুখের লালিমা চেপে রেখে বললাম কত বেতন পাই।

জেভারকভ রাজসিক মেজাজে বলল, 'বেতন তো বিশেষ সুবিধের নয় হে।'

ফারফিচকিন বেয়াদবের মতো বলল, 'ওই বেতন পেয়ে কি দামি হোটেলে খাওয়া যায়?'

ক্রুদোলিউবভ গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল, 'আমারও তাই মনে হয়, এটা কোনো বেতনই না।'

'কী যে রোগা হয়ে গেছ! অনেক বদলে গেছ তুমি', নিজের মনোভাব চাপা রেখে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলল জেভারকভ।

ফারফিচকিন উদার হতে চেষ্টা করে। 'আহা, ও লজ্জা পাচ্ছে তো।'

'না, জনাব, লজ্জা পাচ্ছি না', শেষ পর্যন্ত মুখ খুললাম। 'বুঝতে পেরেছ? এই তো...এই হোটেলে বসে খাচ্ছি ... নিজের খরচায় অন্যের কাঁধে চেপে খাচ্ছি না। বুঝতে পেরেছ, ফারফিচকিন মিয়া?'

'সে আবার কী? এখানে তো সবাই নিজের খরচাতেই খাচ্ছে। তোমার এই কথার মানে তো...' রাগে বোবা হয়ে গেছে ফারফিচকিন ; তাকে দেখাচ্ছে গলদা চিংড়ির মতো লাল ; কথাটা শেষ করতে পারল না।

বুঝতে পারলাম , একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বললাম, 'কথার মানে ওই যা বলেছি, তাই। আমার তো মনে হয় অন্য বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করাই ভালো। সুন্দর সুন্দর প্রসঙ্গের কি অভাব আছে?'

'মনে হচ্ছে তুমি প্রসঙ্গ বিষয়ে জ্ঞানদান করতে এসেছ!'

'খামোকা গণ্ডগোল কোরো না। এখানে ওসব মানায় না।'

'তুমিই বা কেন প্যাচাল পাড়ছ? অফিসে কেরানিগিরি করতে গিয়ে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব শেষ।'

জেভারকভ গর্জে উঠল, 'অনেক হয়েছে, ভাই অনেক হয়েছে।'

'যত্তসব ফালতু ব্যাপার' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল সিমোনভ।

'সত্যি ফালতু। আমরা কোথায় একত্র হলাম একজন কমরেডকে বিদায় জানানোর জন্যে', ক্রুদোলিউবভ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছ। এখন দয়া করে পরিবেশটা নষ্ট কোরো না।'

জেভারকভ বলল, 'হয়েছে, হয়েছে। এবার থামো ভাইসব। এখানে এসব ঝগড়াঝাঁটি ভালো নয়। এখন অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। পরশুদিন কী হয়েছিল জানো? প্রায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল আমার।'

এরপর একনাগাড়ে কিছুক্ষণ চলল কীভাবে এক পেটি আর্মি অফিসারের বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল---সেই গল্প। গল্পের বিবরণে অনেক জেনারেল, কর্নেল, সাহেব-সুবো জড়িয়ে পড়লেন। শুধু বিয়ে সম্পর্কেই কিছু জানা গেল না। পুরো ঘটনা জুড়ে একা জেভারকভই নায়ক। তোষামোদের হাসিতে গড়িয়ে পড়ল তার বন্ধুরা। ফারফিচকিন তো রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। বিব্রত, অপমানিত মুখে বসে আছি। ভাবলাম, 'আল্লাহই বাঁচানেওয়ালা, এই লোকগুলোর সঙ্গে বিশেষ মিশতে হয় না আমাকে। কী যে ভুল করেছি ওদের এই খোঁয়াড়ে পা দিয়ে। নাহ, ফারফিচকিন জানোয়ারটাকে একটু বেশি বাড় বাড়তে দিয়েছি। বর্বরগুলোর ধারণা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহা ধন্য করে ফেলেছে। ওদের মাথায় ঢোকে নি যে এতে আমার কিছু হয় নি, ওদেরই মান-মর্যাদা বেড়েছে। আমি রোগা হয়ে গিয়েছি! আর পোশাকের যা বাহার! বিশেষ করে ট্রাউজারের হাল তো খুব খারাপ! ঘরে ঢুকেই হলদে দাগটা জেভারকভের চোখে পড়েছে। কিন্তু তাতে কী? আমি এখনই উঠে পড়ব। আর একমিনিটও এখানে নয়। আর একটিও কথা নয়। কালই একটা চ্যালেঞ্জ পাঠাব। ইতর কোথাকার! সাত রুবলের জন্য মরে যাব নাকি? তাদের তো ধারণা... চুলোয় যাক সে-কথা! জাহান্নামে যাক সাত রুবল। এখনই বেরিয়ে যাব।

কিন্তু ভাবলেই কিছু যাওয়া যায় না। একটানা গ্লাসভর্তি শেরী আর লেফিতি পান করতে লাগলাম। এত পানীয় গ্রহণের অভ্যেস আমার নেই ; অল্প সময়ের মধ্যেই নেশায় বুঁদ হয়ে গেলাম। মদ যখনই মাথায় পৌঁছল, অমনি মেজাজ খিচড়ে গেল। কেবলই মনে হল, ওদের আরও বিশ্রী কায়দায় অপমান করা দরকার। তখন বুঝবে, আমি কী জিনিস! না বুঝুক, তাতেই বা কী? গোল্লায় যাক শয়তানগুলো।

ঢুলুঢুলু চোখে আমি ওদের মুখগুলো পরীক্ষা করলাম। মনে হচ্ছে, ওরা বেমালুম ভুলে গেছে আমার কথা। তারা নিজেদের বকবকানিতেই মশগুল। প্রায় সবসময় জেভারকভ একাই কথা বলছে। আমিও শুনছি। জেভারকভ এক রমণীর কথা বলছে, যে কিনা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে তার সঙ্গে প্রেম করতে (বেপরোয়া মিথ্যে বলে যাচ্ছে সে, জানি) আর তার এক বিশেষ খাতিরের লোক—ধনী

জমিদার (রাজা কোলিয়া না কে যেন) তাকে সাহায্য করেছে।

হঠাৎ কথার মাঝখানে বলে বসলাম, 'তোমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু— ! সে তোমার বিদায়ের ডিনার পার্টিতে এল না যে !'

একমিনিটের জন্য সবাই নীরব রইল।

'তুমি মাতাল হয়ে গিয়েছ, এরই মধ্যে', আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অন্যদের বলল ক্রুদোলিউবভ। জেভারকভ কোনো কথা না-বলে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি পতঙ্গবিশেষ। চোখ নামিয়ে নিলাম। সিমোনভ চটচলদি সব খালি গ্লাসগুলোতে শ্যাম্পেন ভরতে শুরু করল।

ক্রুদোলিউবভ গ্লাস তুলে নিল। অন্য সবাই অনুসরণ করল তাকে। আমি গ্লাস তুললাম না। ক্রুদোলিউবভ বলল, 'তোমার সুস্বাস্থ্য আর সফল যাত্রা কামনা করছি। আমাদের পুরোনো দিনের কথা মনে রেখো। সবই আমাদের সৌভাগ্য। হুররে !'

সবাই গ্লাস তুলে ঠোকাঠুকি করল, তারপর জেভারকভকে ঘিরে ধরে চুমু খেল। আমি ঠায় বসে থাকলাম ; গ্লাসটা স্পর্শও করলাম না।

ক্রুদোলিউবভ ধৈর্য হারিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বলল, 'কী হল, তুমি আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখবে না?'

'আমি আমার দায়িত্বে আমার ইচ্ছেমতো ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানাব। তারপর ওর স্বাস্থ্য কামনা করে ড্রিংক করব, মিস্টার ক্রুদোলিউবভ।'

সিমোনভ চাপা গলায় হিসহিস করল, 'বুনো জানোয়ার।' আমি চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে নিলাম। একটা বিশেষ ধরনের বক্তব্য পেশ করার প্রস্তুতি নিলাম, যদিও গুছিয়ে ভাবতে পারছি না ঠিক কী বলব।

'চমৎকার নীরবতা'। ফারফিচকিন বলল, 'বিদ্যে–বুদ্ধি জাহির করা হচ্ছে না তাহলে !'

জেভারকভ সেয়ানা মানুষ। কী ঘটতে পারে, আঁচ করেছে। গম্ভীরমুখে অপেক্ষা করছে সে।

আমি শুরু করলাম, 'মিস্টার লেফটেন্যান্ট জেভারকভ, আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমি গালভরা বুলি কিংবা বুলিবাজ–তোষামোদপ্রিয় মানুষ পছন্দ করি না। এই হচ্ছে প্রথম কথা। আরও কথা আছে।'

মৃদু চাঞ্চল্য শুরু হল শ্রোতাদের মধ্যে।

'দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি নোংরামি ঘৃণা করি। যারা অশ্লীল কথা বলে তাদেরকে সহ্য করতে পারি না। তৃতীয় বক্তব্য ; আমি ন্যায়, সত্য আর সততা ভালোবাসি। আমি চিন্তাশীলতা পছন্দ করি, মঁসিয়ে জেভারকভ। আমি সত্যিকার কমরেডসুলভ আচরণের পক্ষপাতী। আমি চাই সবাই সমান মর্যাদায় পাশাপাশি চলবে। তো অবশ্যই তোমার স্বাস্থ্য পানে আমার কোনো আপত্তি নেই।

চালিয়ে যাও, মিস্টার জেভারকভ, সার্কেশিয়ান মেয়েগুলোকে পটাও, স্বদেশের শত্রুদের নির্মূল করো   আর   এই বলেই আমি তোমার স্বাস্থ্য পান করছি মঁসিয়ে জেভারকভ।'

জেভারকভ উঠে দাঁড়াল , আমার দিকে নত হয়ে শুভেচ্ছা জানাল। 'আমি তোমার বক্তব্য শুনে কৃতজ্ঞবোধ করছি।'

জেভারকভের মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। ভীষণ অপমানিত বোধ করছে সে।

টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে ক্রুদোলিউবভ বলল, 'কচুপোড়া খাও, মিয়া।'

ফারফিচকিন বলল, একটা চড় দেয়া দরকার ওর মুখে।'

সিমোনভ দাতে দাঁত চেপে বলল, 'ওকে বার করে দেয়াই ভালো।'

'আর একটিও কথা নয়, বন্ধুগণ একদম নড়বে না', কঠোর স্বরে বলল জেভারকভ। 'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি নিজেই তাকে দেখব, তার কথার কতখানি মূল্য দিয়েছি।'

আমি গলার স্বর খানিকটা চড়িয়ে বললাম, 'মিস্টার ফারফিচকিন, তোমার আজকের কথাটার মূল্য আমি শোধ করব আগামীকাল।'

'তার মানে, মারামারি করবে নাকি?'

এই কথার একটা জুতসই উত্তর ওর পাওনা ছিল। কিন্তু সেটা আর হল না ; ওদের হাসির তোড়ে আমার উত্তর হারিয়ে গেল।

ক্রুদোলিউবভ বলল, 'বাদ দাও, ও ব্যাটা পুরো মাতাল হয়ে গেছে।' সিমোনভ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল, 'নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে। ওকে সঙ্গে নেয়াটা মোটেই ভালো কাজ হয় নি।'

ভাবলাম, ওদের মাথার ওপর বোতল ভাঙার এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময়। বোতল তুলে গ্লাস ভরে নিলাম। না, বরং শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। আমি চলে গেলে তো ওদেরই জিত। কেন যাব আমি? আমি বসেই থাকব, বসে বসে মদ খাব। এটা তো কারুর বাড়ি নয়। সর্বসাধারণের স্থান। প্রবেশ বাবদ কিছু দামও দিয়েছি। মদ খাব আর গান গাইব। যদি গান গাইতে ইচ্ছে হয়, গাইব না কেন? অ্যাঁ?

গান গাওয়া অবশ্য হল না। চেষ্টা করলাম ওদের দিকে না তাকাতে। দাঁতে দাঁত চেপে ধৈর্য ধরলাম। যা-কিছু বলার ওরাই প্রথম বলুক। যদি কিছু করতে চায়, ওদেরকেই সুযোগ দেব। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলল না । আহা, কী যে সাধ হল ওই সময়, আবার ওদের সঙ্গে ভাব করি, আমাদের সব গোলমাল মিটে যাক!

আটটা বাজল। একসময় নটা বাজল। টেবিল থেকে উঠে তারা সোফায় গিয়ে বসল। জেভারকভ লাউঞ্জে আধশোয়া হয়ে পা তুলে দিল ছোট টেবিলটার ওপর। সেখানে মদের বোতল নিয়ে যাওয়া হল। সে নিজের খরচায় তিন বোতলের অর্ডার দিয়েছিল। সেখানে আমাকে ডাকা হল না। ওরা তাকে ঘিরে বসে থাকল।

পরম শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে তার কথা শুনতে লাগল। সন্দেহ নেই. ওরা সবাই জেভারকভের মন্ত্রমুগ্ধ ভক্ত। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, কেন? কিসের জন্য? মাঝে মাঝেই ওরা তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুমু খাচ্ছে, গভীর আবেগের সঙ্গে কথা বলছে। কেন? তারা ককেসাস নিয়ে আলোচনা করছে। কথা বলছে সত্যিকার প্রেম আর জৈবিক তাড়না নিয়ে ; পেশাগত সমস্যা, পোধারজেভস্কি নামের এক অশ্বারোহী সৈনিকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রিন্সেস ডি-র রূপলাবণ্য—যাকে ওরা কেউই দেখে নি—এইসবও আছে। শেষ পর্যন্ত শেকস্‌পীয়র পর্যন্ত গড়াল আলাপ। শেকস্‌পীয়র নাকি মরেন নি।

আমি একাই ঘরের অন্য দিকটায় পায়চারি করে বেড়ালাম। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওদের সঙ্গ ছাড়াও আমি চলতে পারি। মাঝে মাঝে অকারণ হাস্যকর শব্দ করছি, মেঝের ওপর বুট ঠুকছি। তবু ওরা কেউ আমার দিকে ফিরে তাকাল না। আমি হাসিমুখে একাই ঘুরি, বসি। ওয়েটার মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। আমার অবস্থাটা আঁচ করার চেষ্টা করে। ওর জন্য আমার মায়া হয়।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? তিনটে ঘন্টা আমার কাছে তিন যুগেরও বেশি দীর্ঘ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি বুঝি সত্যি বিকারগ্রস্ত। কখনও ঘেমে নেয়ে উঠি ; আবার দেখি শরীরের উত্তাপ শুষে নিচ্ছে সেই ঘাম। এভাবে কেউ নিজেকে বিব্রত করতে পারে, এমন নোংরা ব্যাপারের সঙ্গে স্বেচ্ছায় জড়াতে পারে, ভাবা যায় না। এমনও মনে হচ্ছে, আমি ভুল করছি, ওরাই ঠিক বলছে, সঠিক আচরণ করছে। নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছি না, এমনি অবস্থা। নিজের দেয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছি, আবার কখনও ইচ্ছে করছে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। বুঝতে পারছি না, কী করব, কী করার ক্ষমতা আছে আমার। যা করতে চাই, ভেবে দেখি, তার কোনো মানে হয় না।

একটা ব্যতিক্রম ঘটল শুধু একবার। জেভারকভ যখন শেক্‌সপীয়র সম্পর্কে বক্তৃতা করছে তখন হাসির বেগ সামলাতে না পেরে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম। ভেবেছিলাম, ঘটনা নাটকীয় মোড় ঘুরতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই হল না। ওরা কথা বন্ধ করে চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে তাকল। এভাবে দু-মিনিট গেল। ওরা আবার ফিরে গেল নিজেদের আলোচনায়। এগারটা বাজল।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল জেভারকভ। 'এবার তবে ওঠা যাক, বন্ধুগণ। চলো "ওইখানে" যাই—

অন্যেরা একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।'

আমি ক্ষিপ্রগতিতে জেভারকভের দিকে ফিরে তাকাই। ভীষণ অবসন্ন, ভীষণ অপমানিত, বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। 'জেভারকভ, মাফ করে দিয়ো। ফারফিচকিন, তোমাকে বলছি, সবাইকেই বলছি ; তোমাদের সাংঘাতিক অপমান করেছি আমি।'

ফারফিচকিন সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ শব্দে বলল, 'আহা! মারামারি ছাড়াই এর

মীমাংসা করতে চাও নাকি? নিজের সুবিধেমতো?'

কথাটা আমার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঘা খেল যেন।

'মারামারির ভয় পাই না, ফারফিচকিন। কালই লড়তে রাজি আছি। তুমি না চাইলেও আমি চাইব, একদফা হয়ে যাক। প্রমাণ পাবে, আমি ভয় পাই না, প্রথম আঘাতটা অবশ্য তোমার দিক থেকেই আশা করব। তারপর আমার আঘাত করার বেলা দেখব, কেউ নেই, শূন্যের সঙ্গে লড়াই করছি।'

সিমোনভ বলল, 'এইসব বলে ও নিজেকে ভোলাচ্ছে।'

'ওর মেজাজ খিঁচড়ে আছে এখনও', মন্তব্য করল ত্রুদোলিউবভ।

জেভারকভ শীতল স্বরে বলল, 'যাক, আমাদের যেতে দাও। পথ আটকে রেখেছ কেন?'

সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের মুখ টুকটুকে লাল। দেদার মদ খেয়েছে সব।

'আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, জেভারকভ। স্বীকার করছি, আমি তোমাকে অপমান করেছি, তবু...

'অপমান করেছ! আমাকে! কস্মিনকালেও না, কোনোভাবেই না। তুমি আমাকে অপমান করার ক্ষমতাই রাখো না।'

ত্রুদোলিউবভ ঝামেলাটা চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করল। 'অনেক হয়েছে, এবার পথ ছেড়ে দাও।'

জেভারকভ উঁচু গলায় বলল, 'বন্ধুগণ, কথা ঠিক আছে তো? অলিম্পিয়া কিন্তু আমার।'

অন্য সবাই হাসতে হাসতে বলল, 'আরে, তোমার দাবি নিয়ে আমরা ঝামেলা করব নাকি? তোমার অধিকার সবার আগে।'

সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। ত্রুদোলিউবভ একটা অশ্লীল গান ধরেছে। সিমোনভ একটু পিছিয়ে পড়েছে ওয়েটারদের বকশিশ দেবার জন্য। আমি গিয়ে ধরলাম তাকে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললাম, 'সিমোনভ, আমাকে ছ-রুবল ধার দাও।'

সিমোনভ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'তুমি আবার আমাদের সঙ্গে আসতে চাও না তো?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'আমার কাছে টাকা নেই', বলে বিদ্‌ঘুটে এক হাসি দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। আমি তার ওভারকোটের কোনা আঁকড়ে ধরলাম। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে সবকিছু।

'সিমোনভ, আমি দেখেছি, তোমার কাছে টাকা আছে। কেন ফিরিয়ে দিচ্ছ আমাকে? আমি কি এতই নীচ? দোহাই তোমার, না বোলো না। তুমি জানো না, কেন টাকাটা চাই। আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপর। আমার সমস্ত পরিকল্পনা।'

টাকা বার করে প্রায় আমার মুখের ওপর ছুড়ে দিল সিমোনভ।

'নাও, লজ্জা-শরমের বালাই যদি না থাকে'—নির্দয়-নিষ্ঠুর ভাবে কথাগুলো আমার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে দ্রুত ছুটল সিমোনভ সঙ্গীদের ধরার জন্য।

আমি একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। কামরার সব এলোমেলো হয়ে আছে। টেবিলে ডিনারের অবশিষ্ট তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। মেঝের ওপর একটা মদের গ্লাস ভেঙে পড়ে আছে। খানিকটা মদও গড়াচ্ছে। সিগারেটের টুকরো, মদের বাষ্প, মাথার ভিতর ভীষণ ঝিমঝিম ভাব, বুকের কষ্ট সব মিলিয়ে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড়। বাড়তি উপদ্রব একজন কৌতূহলী ওয়েটার। সব শুনেছে। বিশেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি ওখানে।' চিৎকার করে উঠি আমি। 'হয় ওরা সবাই হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে আমার বন্ধুত্বের জন্য আবেদন জানাবে, না হয় আমি সোজা চড় মারব জেভারকভের মুখে।'

পাঁচ

'তো..এই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এই হচ্ছে সত্যিকার জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।' সিঁড়ি দিয়ে দুড়দাড় করে নামতে নামতে আমি বিড়বিড় করি। 'রোম ছেড়ে পোপের ব্রাজিল চলে যাওয়া আর লেক কোমোর বল নাচ থেকে এ একেবারেই আলাদা!'

এর পরপরই যে-কথা মনে ঝলসে উঠল তা হচ্ছে, 'এখন যদি এসব নিয়ে ঠাট্টা করো, তোমাকে ইতর বলব।'

'বয়েই গেল', নিজেকেই ধমকে উঠলাম উঁচু শব্দে। 'সবই তো গেছে!'

তাদের টিকিটিরও পাত্তা নেই। কিন্তু সত্যি তাতে কিছু যায়-আসে না। আমি জানি ওরা কোথায় গেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ভাঙাচোরা স্লেজগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে চালক। পরনে পুরু কাপড়, মুখে পাউডারের মতো ছড়িয়ে আছে বরফ। ভেজা বরফ, তবু মনে হচ্ছিল যেন গরম। কাশছিল লোকটা। তার ছোটখাটো, সাদা-কালো ফুটকিওয়ালা ঘোড়াটাও কাশছিল। তার শরীরও বরফে ঢাকা। তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলাম সেই স্লেজগাড়িতে। যেই পা উঠিয়েছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সিমোনভ কীভাবে আমাকে ছ-রুবল দিয়েছে আর অমনি মনে হলো দু-ভাঁজ হয়ে পুঁটলির মতো গড়িয়ে পড়লাম গাড়ির ভিতরে।

'সব শোধ করে দেব', চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'শোধ করব, না হয় আজ রাতেই শেষ হয়ে যাব। চালাও!'

গাড়ি ছুটল। মাথার ভিতর তুমুল পাক দিচ্ছে।

'তারা আমার সঙ্গে মিতালি পাতানোর জন্যে হাঁটু গেড়ে বসবে না। এটা আসলে মরীচিকা। বিভ্রম। সস্তা বিদ্রোহাত্মক, রোম্যান্টিক কল্পনাবিলাস। এ হচ্ছে

আরেকটা লেক কোমোর বল নাচ। সুতরাং জেভারকভের গালে চড় মারতে বাধ্য আমি। এটা এখন আমার কর্তব্য। সুতরাং এটাই পাকা কথা। ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড এক চড় কষাব ওর গালে। জলদি চালাও!'

চালক লাগাম আঁকড়ে ধরল শক্ত করে।

'ঘরে ঢুকেই ওর গালে চড় লাগাব। তার আগে কোনো ভূমিকা দেব নাকি? নাহ। কিসের ভূমিকা? সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ব, তারপর এক থাপ্পড়। তারা সবাই ড্রইংরুমে বসে আছে। অলিম্পিয়াকে নিয়ে সেই সোফায়। সেই হারামী অলিম্পিয়া। একদিন আমার চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, অপমান করেছিল। ওর চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলব। জেভারকভের কানদুটো ধরে এমন টান দেব! না, দুটো না, বরং একটা কানই ধরব, তাতে ওকে সারাঘরে টেনে নিয়ে বেড়ানো যাবে। হয়তো ওরা সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, মারধর করবে, বার করে দেবে ঘর থেকে। সেটাই তো স্বাভাবিক। তা হোক তবু প্রথম চড়টা আমিই ওর গালে বসাব। তারপর সে যতই আঘাত করুক, যতই মল্লযুদ্ধে নামুক, সেই প্রথম চড়ের দাগটা তো সে কিছু মুছে ফেলতে পারছে না। সবাই মিলে মারুক না আমাকে! মারুক না অকৃতজ্ঞ শয়তানগুলো। ক্রুদোলিউবভের গায়ে সবচেয়ে বেশি জোর; ওই সবচেয়ে জোরে আঘাত করতে পারবে। ফারফিচকিন নিশ্চয় একপাশ থেকে ধরে থাকবে আমাকে। চুল টেনে ধরবে। তাতে কিচ্ছু যায়-আসে না। কিচ্ছু না। আমি তা-ই করব। গোঁয়ারগুলো দেখবে এর পরিণতি কী হয়। তারা যখন টেনে-হিঁচড়ে আমাকে দরজার কাছে নিয়ে যাবে, আমি চিৎকার করে বলব, তারা আমার কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয়। ড্রাইভার, জলদি চালাও, জলদি।' ড্রাইভারের উদ্দেশে আমি বুনো চিৎকার জুড়ে দিলাম। সে চাবুক কষল ঘোড়ার পিঠে।

'লড়াইটা হবে সন্ধের সময়। সব ঠিক করে ফেলেছি। অফিসের কাজকর্ম তার আগেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পিস্তল কোথায় পাব? ধেত্তেরি। বেতন আগাম তুলে নেব, পিস্তল কিনব। আর কার্তুজ? আর বুলেট? আরে, তার জন্যে কারুর সাহায্য নিলেই হবে। আচ্ছা। কোথায় পাব সাহায্যকারী? বন্ধুবান্ধব। কেউ তো আমার নেই। যত্তসব!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। ছটফট করতে লাগলাম। 'অতশত ভেবে লাভ নেই। রাস্তায় প্রথম যাকে পাব, সে-ই আমাকে সাহায্য করতে বাধ্য। সে-ই হবে আমার সাহায্যকারী। পথের পাশে কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে দেখলে সে যেমন সাহায্য করতে বাধ্য হয়, তেমনি। একেবারে উদ্ভট কোনো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদি আমাদের ডিরেকটর সাহেবকেই ধরি, উনি সাহায্যে করবেন না? আন্তন আন্তনিচ?'

যতই বকাবকি করছি, ততই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠছে। 'চালাও, ড্রাইভার, গাধা কোথাকার! চালাও।'

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তির উত্তর শুনতে পাই। 'জি. হুজুর, এই তো...

শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নামছে, টের পাই। 'আচ্ছা. এর চেয়ে সোজা বাসায় গেলে ভালো হয় না? আল্লা রে আল্লা ! কেন যে সেধে এই দাওয়াত কবুল করেছিলাম? চালাও !'

আচ্ছা, ওরা যদি আমাকে ধরে হাজতে পুরে দেয়? ওদের অত সাহস হবে না। কেলেঙ্কারির ভয় কে না পায়? আর যদি জেভারকভ আমার সঙ্গে লড়তে রাজি না হয়? ওদের দেখিয়ে দেব মজাটা। ... কালই, যখন সে বাসা থেকে বেরুবে, আমি তখন ধরব ব্যাটাকে। ঠ্যাঙ ধরে টানব। যদি গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করে, হ্যাঁচকা টানে ওর কোট খুলে ফেলব। ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দেব। কামড়ে মাংস তুলে নেব। 'এই দেখো, বেপরোয়া মানুষ তোমার কী ক্ষতি করতে পারে।' সে নিশ্চয় আমাকে পালটা আঘাত করবে, হাঁকডাক দিয়ে লোক জড়ো করবে। করুক। আমি সবাইকে চিৎকার করে বলব, 'দেখুন এই কুকুরটা যাচ্ছে মেয়েদের পাকড়াও করতে। তার আগে ওর মুখে থুতু দেব আমি।'

এরপর নিশ্চয় সবকিছুর ইতি ঘটবে। বন্দি করা হবে আমাকে। বিচার করা হবে। আমার চাকরি যাবে। জেলে দেয়া হবে আমাকে । সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হবে। তাতে দুঃখ নেই। পনের বছর পর যখন ছাড়া পাব, ভিখিরির জীর্ণ বেশে তাকে গিয়ে ধরব। হয়তো কোনো জেলা শহরে। বিয়ে করেছে, সুখেই আছে, একটা তন্বী তরুণী মেয়ের বাপ হয়েছে। তাকে গিয়ে বলব, 'এই রাক্ষস, আমার ভাঙা চোয়ালে আর এই শতচ্ছিন্ন কাপড়ের দিকে তাকা! দ্যাখ, আমি সব হারিয়েছি—চাকরি, আয়-উন্নতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, আর সেই —যাকে আমি ভালোবাসতাম, সব, সবকিছু। কেবল তোর কারণে। এই যে পিস্তল। শুশুশু এবার আমি তোকে মাফ করে দেব। তারপর শুধু একটি গুলির শব্দ আর কখনও আমার চিৎকার শুনবে না সে।

কান্না এসে গেল। ভালোভাবেই জানি, যে দৃশ্যকল্পের অবতারণা করেছি, এর সবটাই পুশকিনের 'সিলভিও' আর লারমন্তভের 'মাস্কারেড' থেকে নেয়া। এত লজ্জা পেলাম যে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম, রমণীঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম তুষারঝড়ের মধ্যে। চালক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কী করি? ওখানে যাওয়া যায় না। একেবারে বিশ্রী ব্যাপার হবে। কিন্তু বিনা বাধায় সব ছেড়ে দিই কী করে? এই জঘন্য অপমানের পর! চিৎকার করে উঠলাম, 'না!' আবার এসে উঠলাম স্লেজগাড়িতে। ড্রাইভারের কাঁধে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'ভাগ্যে যা ছিল তা-ই হয়েছে। এরই নাম কপাল চালাও, চালাও !'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষতে শুরু করে চালক চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে, হুজুর? আমাকে মারছেন কেন?'

বড় বড় দলায় তুষার পড়ছে। কোটের বোতাম খুলে ফেললাম। বরফের টুকরো

ঢুকে পড়ছে আমার শরীরে। তারপর গলে যাচ্ছে। আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। অন্য সবকিছু ভুলে গিয়েছি। আমার একটাই চিন্তা চড় মারতে হবে। এইমাত্র পাকা পাস সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মৃতের সৎকারের সময় মৃদু আলোর মোমবাতিগুলোকে যেমন দেখায় তেমনই ম্রিয়মাণ, ঝাপসা দেখাচ্ছে চারদিকে।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতো লাফিয়ে নামলাম গাড়ি থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, ঘোরের মধ্যেই দরজায় ধাক্কা আর লাথি দিতে শুরু করলাম। বিষম দুর্বল লাগছে। বিশেষ করে হাঁটু আর পায়ের কাছটায়। মুহূর্তের মধ্যে দরজা খুলে গেল। যেন ওরা জানত, আমি আসছি। আসলে সিমোনভ তাদের জানিয়ে রেখেছে, এক ভদ্রলোক আসছেন। বাড়িটা আগে ছিল গণিকালয়। পুলিশ অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। এখন দিনের বেলা দোকান হিসেবে চালানো হয় ; রাতে অন্য কাজে লাগে। তবে আগে নোটিশ না দেয়া থাকলে ঢুকতে পারা সহজ নয়।

অন্ধকার দোকানঘর পার হয়ে পরিচিত ড্রইংরুমে চলে এলাম। একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অন্য কাউকে দেখছি না। শুধু একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওরা কোথায়?’ সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, একটু আগেও তারা একসঙ্গে ছিল ; এখন আলাদা হয়ে গেছে। রমণীটি আগেও আমাকে দেখেছে। দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় মিনিটখানেক গেল। তারপর ঘরে ঢুকল অন্য একজন।

কারুর দিকে না-তাকিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি শুরু করলাম। খুব সম্ভব আপনমনে বিড়বিড় করে কথাও বললাম দুয়েকটা। মনে হচ্ছে সহসা মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছি। বেশ আনন্দ লাগছে নতুন জীবনটা পেয়ে। চড় মারার পরিকল্পনাটা অবশ্য ভুলতে পারছি না। চড় অবশ্যই মারতাম। কিন্তু কাকে মারব? ওরা তো কেউ নেই। পুরো পরিবেশই বদলে গেছে। আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছি ; পারছি না।

যে-মেয়েটি পরে ঢুকল, তার দিকে তাকালাম যন্ত্রচালিতের মতো। কচি, ডাগর-ডোগর, খানিকটা মলিন মুখ। কিন্তু চোখ দুটো গভীর কালো, টানা ভ্রূরেখা। চোখজোড়া মুহূর্তের মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করল। আগের মহিলাটির মতো হাসি নেই তার মুখে ; থাকলে ঘৃণা আসত আমার। আমি একটু এগিয়ে গেলাম। আরও গভীরভাবে লক্ষ করলাম তাকে। তার মুখে একটি অপরূপ মায়া জেগে আছে। হঠাৎ মনে হল মেয়েটি ভালো। চমৎকার মন তার। কিন্তু কেমন যেন গাম্ভীর্য ঘিরে আছে তাকে। সবাই এই ব্যাপারটি বুঝবে না। মনে হল, এখানে আসার সঙ্গে ওই গাম্ভীর্যের কোনো একটা সম্পর্ক আছে। মেয়েটি লম্বা, শক্ত-সমর্থ, শরীরের গাঁথুনিও চমৎকার। তবু তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। পরনে সাদাসিধে পোশাক। আমার ভিতরে কেমন যেন আলোড়ন শুরু হল। সোজা গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালাম।

কাছেই আয়না পেয়ে আমি নিজের চেহারা লক্ষ করলাম। চুল উষ্কখুষ্ক। চেহারা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। হাসি পেল। খুব খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। মেয়েটা আমাকে পছন্দ না করলেই আমি খুশি হই।

ছয়

পর্দার আড়ালে কোথাও থেকে ঘড়ি বাজতে শুরু করেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন তার গলা টিপে ধরল। দুটো বাজে। ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমিয়েছি বললে অবশ্য একটু ভুল হবে। আমি আসলে অর্ধচেতন অবস্থায় কাটিয়েছি পুরোটা সময়।

ছোট স্যাঁতসেঁতে ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার। চারদিকে ঠাসবুনানো অবস্থায় রাখা হয়েছে পুরোনো, সস্তা আসবাব আর ব্যবহার্য জিনিসপত্র। টেবিলের মোমবাতিটা প্রায় নিঃশেষ ; থেকে থেকে দপদপ করে উঠছে শিখা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিকষ অন্ধকার নেমে আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের মধ্যে ফিরে আসি। অনায়াসে মনে করতে পারি, কী হয়েছিল, কোথায় আছি। এমনকি ওই যে অর্ধচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলাম, তার মধ্যেও আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে নিজের অস্তিত্ব আর পারিপার্শ্বিকতা টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মনে হচ্ছে সারাদিন যা ঘটেছে সবই যেন সুদূর অতীতের ঘটনা।

মাথার ভিতরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। কিসের যেন অস্থিরতা, কেমন যেন তাড়না অনুভব করছি। ভিতরের গ্লানি আর বিষণ্নতা বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। এরকম অবস্থায় হঠাৎ বুঝতে পারি, একজোড়া পূর্ণ, বিস্ফারিত চোখ গভীর নিষ্ঠায় আর কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একজোড়া গভীর অন্তর্ভেদী চোখ ; মনে হচ্ছে সে-দৃষ্টি আমার শরীর ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ছে।

মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রবাহ অনুভব করি ; ঠিক যেমন অনুভূতি জাগে গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দি কোনো মানুষের। যে-চোখজোড়া আমাকে পরীক্ষা করছে, তাকে ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। বুঝতে পারি, গত দু-ঘণ্টা ধরেই ওই দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। অখণ্ড নীরবতা ভেঙে কথা বলার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না ; তার বদলে অজ্ঞাত এক ধরনের আতঙ্ক গ্রাস করছে আমাকে। হঠাৎ আমি এক গোপন তাড়নার অস্তিত্ব টের পাই। এটা একরকমের বাসনা—ভালোবাসা ছাড়াই যা পূরণ করা যায়। স্থূল, নির্লজ্জ সেই গ্রাসের ভিতর দিয়ে ভালোবাসা নিজেই কোনোরকমে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নেয়। অনেকটা সময় এভাবে আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। এই সময়ের ভিতর একবারও সে চোখের পাতা ফেলে নি, কিংবা তার দৃষ্টিতেও আসে নি কোনো পরিবর্তন। নিজের ভিতরেই অস্বস্তির অস্তিত্ব টের পাই ; চোখ নামাই আমি। কিন্তু এও বুঝতে পারি,

একটা পরিবর্তন দরকার।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম তোমার?'

'লিসা', প্রায় নিঃশব্দ উত্তর দিয়ে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটা। চুপ করে রইলাম।

তারপর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছি, এমনিভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বিশ্রী আবহাওয়া....বরফ পড়ছে তো পড়ছেই।'

মেয়েটি উত্তর দিল না। দুর্ভাবনার ব্যাপার।

'বরাবর পিটার্সবুর্গেই আছ?' কিছুক্ষণ পর তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম। ধীরে ধীরে রাগটা ফিরে আসছে।

'না।'

'তাহলে কোত্থেকে এসেছ?'

খানিকটা আলস্যের সঙ্গে মেয়েটি বলল, 'রিগা থেকে।'

'তুমি জার্মান নাকি?'

'না, রাশান।'

'অনেকদিন ধরে আছ?'

'কোথায়?'

'এই বাড়িতে!'

'এই তো...দিন পনের...'

মোমবাতি নিভে গেল। মেয়েটির মুখ আর দেখতে পাচ্ছি না।

'বাবা–মা আছে?'

'না ...হ্যাঁ আছে।'

'কোথায় থাকে তারা?'

'ওই ....রিগায়।'

'কী করে?'

'তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না মানে কী?'

'ওই ...সামান্য ব্যবসা–ট্যবসা করে।'

'আগে ওদের সঙ্গেই থাকতে?'

'হ্যাঁ।'

'বয়স কত তোমার?'

'বিশ।'

'ওদের কাছে থেকে চলে এলে কেন?'

'এমনি।'

তার মানে, সে বলতে চায়, এত কথা জানতে চেয়ো না, খারাপ লাগছে।

আমি চুপ করে থাকি। চলে গেলে ভালো হত, কিন্তু যেতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে। কাল অফিসে যাবার পথে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলাম—সেই দৃশ্য

আমার মস্তিষ্কে তালগোল পাকাতে থাকে। হঠাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যেন একটা দুর্ঘটনা——এমনিভাবে বলে ফেলি, 'কাল ওরা খাটিয়ায় করে একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, আর একটু হলেই পথে ফেলে দিয়েছিল প্রায়।'

'মড়ার খাটিয়া?'

'হ্যাঁ। একটা কুঠুরি থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল। হে মার্কেটে।'

আবার নীরবতা নেমে আসে।

নীরবতা ভাঙার জন্য বলি, 'কবর দেওয়া যে ঝকমারি ...এই বিশ্রী আবহাওয়ার ভিতর....'

'ঝকমারি কেন?'

'এই যে...বরফ...ভেজা মাটি...' হাই তুলি আমি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'তাতে কিছু যায়-আসে না।'

আবার হাই তুললাম। 'না, না, ভয়ঙ্কর বিশ্রী ব্যাপার। যারা কবর খোঁড়ে তাদের খুব কষ্ট হয়। কবরের ভিতরটা পানিতে ভরে যায়।'

নিষ্পাপ কৌতূহলের সঙ্গে সে বলল, 'পানিতে ভরে যায় কেন?'

হঠাৎ কেন যেন মনে হল, আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চলছে।

'কেন আবার? মাটির একফুট নিচেই নিশ্চয় পানি আছে। ভলকোভো গোরস্থানে শুকনো কবরের দেখা পাওয়া সহজ নয়।'

'কেন?'

'কেন? বুঝতে পারছ না? পুরো এলাকা তো স্রেফ জলাভূমি। ওরা তাই পানির ভিতরেই মড়া কবর দেয়। নিজের চোখেই তো দেখলাম....কতবার।'

(সত্যি আমি কিন্তু কবর দেয়া দেখি নি। ভলকোভোতেও যাই নি। গল্প শুনেছি মাত্র।)

'তার মানে...আপনি বলতে চাইছেন...মরার পর যা-ই ঘটুক, আপনার কিছু যায়-আসে না?'

'না, নিশ্চয় কিছু যায়-আসে না।'

'কিন্তু আমি মরব কেন?' মেয়েটি বলল—আসলে যেন আত্মরক্ষারই চেষ্টা করছে সে।

'সে কী! একদিন তো সবাইকেই মরতে হব। কালকের খাটিয়ায় যে মেয়েটাকে দেখলাম, তার মতোই তুমি একদিন মারা যাবে। সে মারা গেছে ক্ষয়রোগে।'

'বেশ্যাদের উচিত হাসপাতালে গিয়ে মরা।' (তার মানে ব্যাপারটা তার জানা। 'মেয়েটা' না বলে সে বলেছে 'বেশ্যা।')

বললাম, 'বাড়িওলির কাছে দেনা হয়ে গিয়েছিল তার। টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটেছিল। হে মার্কেটের স্লেজগাড়ির চালকেরা বলাবলি করছিল। কয়েকজন সৈনিকও তার কথা বলছে, শুনলাম। তারা সব শুঁড়িখানায় যাচ্ছিল ওই মেয়েটির স্মৃতির উদ্দেশে মদ খাওয়ার জন্যে।'

একজন বারবণিতা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তথ্য আর কোথায় পাব? চুপ করলাম। আবার নীরবতা নেমে এল ঘরে। অখণ্ড, ভয়ঙ্কর নীরবতা।

আবার বললাম, 'হাসপাতালে মরার সুবিধে কিসে?'

মেয়েটি ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'একই কথা হল নাকি? তার চেয়ে বড় কথা, মরব কেন?'

'আজ না হোক, কাল তো মরবেই।'

'কালই বা কেন?'

'কী মুশকিল! আজ তুমি তরতাজা, ডাগর নারী। বয়স কম ; রূপ-যৌবন আছে। খুব দামে বিকোচ্ছ। কিন্তু ধরো....একবছর পর ....একদম বদলে যাবে। সব ফুরিয়ে যাবে তোমার।'

'এক বছরেই?'

'কথার কথা বললাম আর কি। একবছর পর তোমার দাম কমে যাবে। অন্য কোনো কম দামি বাড়িতে চলে যাবে। তার দু-বছর পর রোজগার আরও কমবে। সাত বছর পর দেখবে, হে মার্কেটের বস্তিতে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছ। আর যদি এর মধ্যে কঠিন কোনো অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বসো...কী করবে? বিনা চিকিৎসায় মরবে। মরবে না?'

'বেশ, তা হলে মরব', বিষম অপ্রসন্ন, বিষণ্নস্বরে বলল মেয়েটি উঠে গেল হঠাৎ করে।

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দুঃখ হয়।'

'কী কথা?'

'জীবনের কথা।'

আবার নীরবতা।

'বিয়ে-টিয়ের কথা হয় নি কারুর সঙ্গে, অ্যাঁ?'

'তাতে আপনার কী?'

'আহা, আমি তোমাকে জেরা করছি না। নিশ্চয় অনেক সমস্যা আছে তোমার। আমার আবার কী? দুঃখ হল, তাই বললাম।'

'কার জন্যে দুঃখ?'

'তোমার জন্যে।'

'কোনো দরকার নেই', শরীর দুলিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করল মেয়েটি, কথাটা বলল ফিসফিসানির শব্দে, কিন্তু বেশ জোরে।

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এত সদয় ব্যবহার করছি মেয়েটির সঙ্গে, আর সে কিনা....

'তোমার কী মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক?'

'আমি তেমন কিছুই ভাবছি না।'

'ওইটেই তো তোমাদের ভুল ধারণা। সময় থাকতেই সব ভাবতে হয়, বুঝলে?

এখনও সময় আছে। তোমার বয়স খুবই কম। দেখতে ভালো। ভালোবাসা, বিয়ে সবই তোমার পক্ষে সম্ভব। সংসার করে সুখী হবার কথা ভেবে দেখতে পার।....'

'বিয়ে করলেই মেয়েরা সুখী হয় না', রুক্ষস্বরে বলল সে।

'হয়তো সবাই হয় না। কিন্তু সে-জীবন অনেক ভালো, অনেক স্বাভাবিক। আর একটা কথা কী জান? সুখী না হয়েও ভালোবাসা যায়। ভালোবাসা নিজেই এক চমৎকার সুখের ইশারা। এই যে আমাদের জীবন....এত দুঃখ, তবু জীবনটা কত মধুর। সুখ ছাড়াই এ-জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এখানে কী পাবে তুমি? নোংরা অশ্লীলতা...ছিঃ....

বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলাম। মনে হল আমার জড়তা আর অস্থিরতা দুটোই কেটে যাচ্ছে। নিজের ভিতর নতুন, স্বাভাবিক অথচ অপ্রত্যাশিত জাগরণ টের পাচ্ছি। অনুভব করছি নিজের ভিতর নিজের উত্থান।

'আমি এখানে এসেছি বলে কিছু মনে কোরো না। আমি কোনো উদাহরণ হওয়ার যোগ্য নই। আমি হয়তো তোমার চেয়েও খারাপ। কতকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই তোমার এখানে ছুটে এসেছি। তা ছাড়া পুরুষ কখনও নারীর জন্যে উদাহরণ হতে পারে না। আমি নিজেকে অনেক নিচে নামাতে পারি, কিন্তু তারপরও কারুর দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হব না। আমি আসব আর যাব, ব্যস, সব শেষ। কিন্তু তুমি গোড়া থেকেই ক্রীতদাসী। তোমাকে তো সবই বিসর্জন দিতে হয়। তোমার নিজের বলে কিছু নেই। পরে তুমি কিন্তু এই শৃঙ্খল ছিঁড়তে চাইলেও পারবে না। এ এক অভিশপ্ত বন্ধন। অন্য কিছু বলছি না, বললেও বুঝবে না। কিন্তু একটা কথা বলো : তুমিও কি তোমার বাড়িওলির কাছে ঋণী?'

চুপচাপ শুনল মেয়েটি। কিছু বলল না।

'এই হচ্ছে তোমার বন্ধন। তোমার শৃঙ্খল। কখনই মুক্তি পাবে না তুমি। তুমি তো....শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছ। আমিও হয়তো শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছতে পেরেছি। জানোই তো, মানুষ দুঃখ ভুলতে মদ খায়। আমি দুঃখ ভুলতে তোমার কাছে এসেছি। এবার বলো তো, এখানে "ভালো" কী আছে? এই যে আমাদের দেখা হল, দুজন দুজনের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। এই কি ভালোবাসা? দুজন মানুষের মধ্যকার মিলন কি এভাবেই হয়?'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ।'

তার এই দ্রুত 'হ্যাঁ' উত্তর শুনে চমকে উঠলাম। তার মানে ওর চিন্তাশক্তি আছে এবং আমার কথা শুনতে শুনতেই ভাবনার কাজটা শেষ করেছে। ধেত্তেরি। কারুর প্রতি আগ্রহ জন্মালে কি ভালোলাগা সৃষ্টি হলে অমন অনেক জিনিস বেরিয়ে পড়ে। হাতে হাত ঘষলাম। এইরকম অল্প বয়সের একটা মেয়েকে পটানো কঠিন কিছু নয়।

নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সে তার মাথা আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল। হয়তো এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আমার স্বরূপ আবিষ্কার করতে চায়। দুঃখ হল, তার চোখদুটো দেখতে পাচ্ছি না। শুধু তার গভীর, কাঁপা কাঁপা নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

'এ-পথে কেন এসেছ?' টের পেলাম, আমার স্বরে পৌরুষ ফিরে এসেছে।

'দূর, জানি না।'

'বাপের বাড়ি কি এর চেয়ে ভালো ছিল না? উষ্ণ, স্বাধীন নিজের ঘর, নিজের মতো করে বাঁচা!'

'কিন্তু সে জীবন তো এর চেয়ে খারাপও হতে পারে।'

মন বলল, সঠিক তালে কথা বলতে হবে। আবেগে ভেসে গেলে চলবে না, মেয়েটাকে মনে ধরেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের মেজাজ-মর্জির সঙ্গে তো আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ না করলে সব ভেসে যাবে।

তাড়াতাড়ি বললাম, 'সেটা কে অস্বীকার করেছে? হতেই পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে ভুল পথে টেনে এনেছে। পাপবিদ্ধ করেছে। আমি তোমার জীবনের কিছুই জানি না। তবু নিশ্চিত বলতে পারি, নিজের ইচ্ছেয় কিংবা লোভে এ-পথে পা বাড়াবে—তেমন মেয়ে তুমি নও। তুমি....'

'আমি ....আমি কেমন?' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি, শোনা যায় কি যায় না—এমন। তবু আমি সবই শুনতে পেলাম।

কোনো মানে হয় না। আমি কেবল মেয়েটির প্রশংসাই করছি। রীতিমতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তবে স্বস্তির বিষয়, সে আর কথা বলছে না।

'শোনো, লিসা, তোমাকে আমার কথা বলি। আমার ঘর ছিল। সেই ছেলেবেলা থেকে আমি ঘরের ছেলে ছিলাম। এখন যেমন দেখছ, এরকম হবার কথা নয় আমার। প্রায়ই কথাটা ভাবি। ঘর যত খারাপই হোক, সেটা ঘর। তোমার বাবা-মা আছে। তারা যা-ই হোক, তোমার শত্রু নয়। অন্তত বছরে একদিন তাদের ভালোবাসা টের পাবে তুমি। যেভাবেই হোক, বুঝতে পারবে, তুমি বাড়িতে আছ। ঘরছাড়া হওয়া কাকে বলে আমি টের পেয়েছি।'

একটু অপেক্ষা করলাম। মেয়েটি বুঝল কি না জানি না। এইসব কথা হয়তো নিছক নীতিকথার মতো শোনাচ্ছে তার কানে। আজগুবি কথা।

কথার মোড় ঘুরিয়ে একটু পরোক্ষভাবে বললাম, 'আমি যদি বাপ হতাম, তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরকেই বেশি ভালোবাসতাম।' বলেই বুঝলাম, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে আমার মুখ।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

আহা! শুনেছে!

'জানি না, লিসা। এক বাপকে চিনতাম। খুবই কড়া মানুষ। কিন্তু মেয়েকে ভালোবাসত উপুড়হস্ত হয়ে। মেয়েটা যখন পার্টিতে নাচত, লোকটা পাঁচঘণ্টা একঠায় দাঁড়িয়ে থাকত দেখার জন্যে। পাগলের মতো ভালোবাসত মেয়েকে। উবু

হয়ে বসে তার হাতে–পায়ে চুমু খেত। মেয়ে না–ঘুমোনো পর্যন্ত জেগে থাকত। তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করত, তার শরীরে ক্রসচিহ্ন আঁকত। নিজে শতচ্ছিন্ন পোশাক পরত অথচ মেয়েকে কিনে দিত দামি দামি সব কাপড়চোপড়। মেয়েকে দিয়েই তার আনন্দ। মায়েদের চেয়েও বাপেরা মেয়েদের বেশি ভালোবাসে। অনেক মেয়ে তো বাপের বাড়িতেই সুখে কাটিয়ে দেয়। আমি বাবা হলে আমার মেয়েদের বিয়ে দিতে পারতাম না।'

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে মেয়েটি বলল, 'তারপর?'

'ঈর্ষা হত আমার। ভাবতেই পারতাম না আমার মেয়ে অন্য কাউকে চুমু খাবে। বাপ ছাড়া অন্য কাউকে সে ভালোবাসতেই পারে না। জানি এসব ফালতু কথা। শেষ পর্যন্ত বাপকে যুক্তি মানতেই হয়। তবু মনে হয়, মেয়ের বিয়ে হবার আগে দুশ্চিন্তায় মরে যেতাম। তার পাত্রের খুঁত ধরতাম। অবশ্যি শেষে নিজে ভালোবেসে যাকে পছন্দ করবে, তাকেই বিয়ে করতে দিতাম। কিন্তু অশান্তি হতে পারত—কেননা মেয়ে যাকে ভালোবাসবে, বাপের কাছে সে–ই তো সবচেয়ে খারাপ পাত্র।'

'কিন্তু কেউ কেউ পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে বিক্রি করে দেয়।'

ও! এই তা হলে ব্যাপার!

স্নেহের সুরে বললাম, 'লিসা, এসব সেই পরিবারগুলোতেই ঘটে যেখানে না আছে ভালোবাসা না আছেন ঈশ্বর। আর যেখানে ভালোবাসা নেই, সেখানে সবই এলোমেলো। এমন পরিবার আছে, সত্যি কথা, কিন্তু তাদের কথা বলছি না। তুমি হয়তো নিজের পরিবারে অনেক কুৎসিত ব্যাপার দেখেছ। তা যদি হয়, বলতে হবে, তোমার কপালটাই খারাপ। তা...কী করবে? ...দারিদ্র্য, বুঝলে, দারিদ্র্য থেকেই এসব হয়।'

'মধ্যবিত্ত সমাজেও কি এসব নোংরামি নেই? অথচ কত দরিদ্র, নিঃস্ব পরিবার আছে, সেখানেও মানুষ সুখে কাটাচ্ছে।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ, লিসা। কিন্তু আর–একটা বিষয় লক্ষ করেছ? মানুষ নিজেই তার সমস্যা খুঁচিয়ে বার করতে ভালোবাসে। আনন্দের কথাটা হিসেবের মধ্যে ধরে না। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে। ধরো, ভালো পরিবারে বড় হয়েছ। ভালো বিয়ে হল। স্বামী খুব ভালোবাসে। তারপর কী? সুখের তো একটা শেষ আছে। সেখানেই দুঃখের শুরু। আবার দুঃখের মধ্যে কি সুখ নেই? নিশ্চয় আছে। তোমার যখন বিয়ে হল নিজের চেষ্টায় সেখানে সব খুঁজে নিলে। এটাও তো হতে পারে। অনেক দম্পতি আছে যারা সুখ বাড়ানোর জন্যে ঝগড়া করে। একে অন্যকে কষ্ট দেয় কেবল তার প্রতি অন্যের আকর্ষণের তীব্রতা যাচাই করার জন্যে। বিশেষ করে মেয়েরা তো প্রায়ই ভালোবাসার মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। যুক্তি কী? "আমি তো ওকে নিশিদিন ভালোবাসি। মাঝে মাঝে না হয় দিলামই একটু জ্বালা।"....ভেবে দেখো,

ভালোবাসার সবটাই সুখ কি না। ...এক মহিলাকে চিনি, বুঝলে? সে ভালোবাসলে কী হবে, স্বামীর ওপর কড়া নজর রাখে। স্বামী যদি একবার কোথাও যায়, পাগলের মতো অনুসরণ করে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, কোথায় কার সঙ্গে কী করছে। কোনো প্রমাণ পায় না। কোনো রহস্যই মেলে না। তবু সে নিজের মনে ধূপকাঠির মতো পোড়ে। ভালোবাসা, বুঝতে পেরেছ? এসব কেবল ভালোবাসার জন্যেই। ভালোবাসার ভাগ দেয়া বড় কষ্টের। অথচ মানুষের সমস্যা দেখো, কিছু ভালোবাসার ভাগ তো ছাড়তেই হয়। ঝগড়ার পর নতুন করে যে ভালোবাসা হয় সে যে কী মধুর, তুমি বুঝবে না। ভালোবাসা এক খাঁটি রহস্য। সবার চোখে সব ভালোবাসা ধরা পড়ে না। দেখবে, সব স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে তাদের নিজেদের সম্পর্কের গোপন চাবিকাঠি আছে ; অন্য কেউ তার নাগাল পাবে না। এক দম্পতির রহস্য কখনই মিলবে না অন্য দম্পতির বেলায়। আসল ব্যাপার হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই কিন্তু ভালোবাসার মূল ভিত্তি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাড়া ভালোবাসার কোনো মানে নেই। যেখানে সহিষ্ণুতা আছে সেখানে শ্রদ্ধা জন্মাবেই। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানেই ভালোবাসা। স্থায়ী ভালোবাসার কথা ভেবে দেখো, সে ভালোবাসার জন্যেই মানুষ ঘর ছাড়ে, ঘর বাঁধে। সে ভালোবাসা হারাবে কেন, বলো? একটু চেষ্টা করলেই ভালোবাসা টিকিয়ে রাখা যায়। ভালোবাসা রহস্যময়, কিন্তু তার দাবি খুব বেশি নয়। দুজন মানুষের অভিন্ন স্বার্থ আর অভিন্ন অনুভবের নামই প্রেম। তাদের মধ্যে কোনো লুকোছাপা থাকে না, কেউ কাউকে কিছু লুকোয় না। যদি লুকোয়, বুঝতে হবে সেটা ভালোবাসা নয়, অন্য কিছু। ভালোবাসার আরেক নিবিড় বন্ধন হচ্ছে সন্তান। নিজেদের চেয়েও তখন সন্তানের স্বার্থ বড় হয়ে যায়। জীবনের জন্যে মানুষ তখন যতই কষ্ট করুক, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সবই আনন্দে পরিণত হয়। সন্তান বড় হয়। যত বড় হয়, বাপমায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসাও তত বেড়ে যায়। বেড়ে যায় দায়িত্ব। এইভাবে পারস্পরিক ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধের গণ্ডি প্রসারিত হয় সংসার স্বর্গের মহিমা পায়। সন্তান বড় মধুর অভিজ্ঞতা। সন্তান ছাড়া দাম্পত্য প্রেম অসম্পূর্ণ। তোমার বাচ্চা ভালো লাগে না, লিসা? আমার খুব ভালো লাগে। কল্পনা করো তো, তোমার কোলে একটি তুলতুলে গোলাপি বাচ্চা। ছোট ছোট দুটো হাত নাড়িয়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে, হাসছে। দুধ খাবার সময় খেলা করছে অন্য স্তন নিয়ে। যেই বাপ কাছে এসে পড়ে, অমনি মায়ের স্তন ছেড়ে দিয়ে কৌতুক করতে শুরু করে তার সঙ্গে। আবার স্তনের দখল হারানোর ভয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মায়ের বুকে। আর যখন তার দাঁত ওঠে, তখন ভারি জ্বালাতন করে। যখন–তখন মায়ের স্তনের বোঁটা কামড়ে দেয়, তারপর হেসে ওঠে খিলখিল করে। মা কি রাগ করে? ওই যন্ত্রণার যে কী আনন্দ, তা মা–ই জানে। এইসবই জীবন। জীবনের এই আনন্দের স্বার্থে অনেক দুঃখকে ক্ষমা করা যায়, লিসা। তবে দুঃখকে দোষ দেবার আগে আনন্দের ঠিকানা তো জেনে নেয়া চাই।'

লম্বা ভাষণ শেষ করেই বুঝলাম, বোকার মতো বকবক করেছি। কী হবে যদি মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে শুরু করে? হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটি অবশ্য হাসল না। চুপ করে থাকল। অসহ্য, অফুরন্ত নীরবতা। কনুই দিয়ে গুঁতো দিলাম তাকে।

'কেন যে আপনি...' বলেই থেমে গেল সে। কিন্তু তার স্বর আমার বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ এই স্বর শুনি নি কোমল, লজ্জা-মাখানো স্বর। হঠাৎ লজ্জা পেলাম। অপরাধী মনে হল নিজেকে।

মমতাভরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কেন'?

'ওই যে...

'ওই যে মানে?'

'কেমন যেন বইয়ের ভাষায় কথা বললেন!'

কথাটায় হয়তো একটু বিদ্রূপ ছিল। কিন্তু আমার বুক আবার ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল। বিদ্রূপের জন্য নয়। কোমলমতি, সরলপ্রাণ মানুষেরা নিজেকে আড়াল করার জন্য এইরকম বিদ্রূপের আশ্রয় নেয় ভেবে। এতক্ষণ বুঝি নি, আমি এতক্ষণ যার সঙ্গে কথা বলেছি, সে আগেই সব জেনে নিয়েছে বুঝে নিয়েছে। সে কেবল নির্বিকারত্বের শক্ত খোলসের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে তার আবেগ, কামনা, বাসনা। বুঝতে পারি নি। হঠাৎ আমার ভিতরে পশুটা আড়মোড়া ভাঙে, কাবু করে ফেলে আমাকে।

'দাঁড়াও, মেয়ে', মনে মনে বলি।

সাত

'বইয়ের ভাষায় কথা বলছি! সে কী, লিসা? আসলে তুমি বোধ হয় এই অচেনা মানুষের বকবকানি শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি অবশ্য তোমাকে আর অচেনা ভাবতে পারছি না। এসব আসলে আমার অন্তরের অনুভব—যা অচেনা কাউকে বলা যায় না। অবশ্য অভ্যেসের ব্যাপারটা আলাদা। অভ্যেস দিয়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। তুমি কি এরকম ভাবতে অভ্যস্ত যে তুমি কখনও বুড়ি হবে না? হয়তো ভাবছ তুমি চিরকালই এমন সুন্দর থাকবে? কিংবা ধরো চিরকাল এখানেই থাকবে? হতে পারে, এখানে তুমি খুব খারাপ নেই তবু জীবনে অনেক কিছুই আছে—অভ্যেস যা জয় করতে পারে না।....আচ্ছা, তোমার এই জীবনের কথাই বলি, মন দিয়ে শোনো। তুমি যতই রূপসী হও, বয়স যতই কাঁচা হোক, তবু এখানে আসার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে, এখানে সুখ নেই। আছে কেবল বিরক্তি আর বিস্বাদ। তোমার সঙ্গও আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। এখানে কখন আসে মানুষ? যখন সে মাতাল হয়, যখন নিজের সত্তা হারিয়ে

ফেলতে চায় তখন। কিন্তু সেই তুমিই যদি অন্য কোথাও থাকতে—ধরো, যেখানে ভালোমানুষেরা থাকে, তুমি আমার কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে। হয়তো আমি তোমার প্রেমে পড়তাম ; তোমার অনন্ত, অফুরন্ত সান্নিধ্যও বিরক্তিকর হত না। তোমার চোখে একটিবার চোখ রাখার জন্যে আমার মন অস্থির হয়ে উঠত। তোমাকে পাওয়া, তোমার ভালোবাসা পাওয়া আমার সাধনা হয়ে উঠত। না, তোমাকে খারাপ ভাবছি না, তোমাকে অস্পৃশ্য মনে করার স্পর্ধা যেন কখনও আমার না হয়। তবু এখন তুমি চাও আর না-চাও, তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে। তোমার ভালোর জন্যেই আসতে হবে। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা ভাবলে তোমার চলবে না। বরং আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা তোমাকে ভাবতেই হবে। সবচেয়ে কম মজুরির যে শ্রমিক, সেও নিজেকে একেবারে বিকিয়ে দেয় না। ইচ্ছেমতো সে স্বাধীন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তোমার মুক্তি কবে, ভাবো তো? তুমি কি জানো, কী খোয়াতে হচ্ছে তোমাকে? কেন এভাবে নিজেকে বন্দি করে রাখছ তুমি? তুমি শুধু তোমার দেহ বিকিয়ে দিচ্ছ না, আত্মাও বিকিয়ে দিচ্ছ। আত্মা বিকিয়ে দেবার কী অধিকার আছে তোমার? একদল মাতালের লালসার নিচে পিষ্ট হচ্ছে তোমার প্রেম—তোমার সুকুমার মন। সামান্য দামে তোমার অমূল্য নারীত্ব—কুমারী-হৃদয়, সুতনু শরীর—সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই নারী-হৃদয়, এই প্রেম পাবার জন্যে কত মানুষ নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি আছে—রাজি আছে জীবন উৎসর্গ করতে—তুমি জানো? একজন নারীর এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু নেই। কেউ কেউ বলে, তুমি সুখ পাও। স্রেফ বাজে কথা। বিশ্বাস করি না। যে-কোনো সময় তুমি অন্যের হয়ে যাবে—এই জেনেশুনে কে তোমাকে ভালোবাসবে, বলো? কে শ্রদ্ধা করবে? তার সঙ্গে তোমার কিসের মিল? সে তোমার সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করবে আর লুট করবে—এই হচ্ছে তার প্রেম। যদি কামড় না খাও, তোমার কপাল ভালো। নইলে তার দংশনও তোমাকে সহ্য করতে হবে। এমন একজন প্রেমিক খুঁজে বার করো তো, যে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে? স্বেচ্ছায় জীবনটা ধ্বংস করে ফেলছ। কেন? ভালো থাকা-খাওয়ার লোভে? কী মানে হয় এই জীবনের? একবারও কি মৃত্যুর কথা মনে হয় না? এই যে প্রেমিকের দল, এই ভালো খাওয়াদাওয়া—সব সাময়িক। কদিন পরেই লোকে তোমাকে ঝুটা মালের মতো এক-কোণে ছুড়ে ফেলে দেবে, দ্রুতগামী ট্রেনের মতো ছুটে যাবে অন্য লক্ষ্যে। কী নোংরা দাসত্ব! কী অপমানজনক! সব তুমি অল্প দামে বিকিয়ে দিচ্ছ। নিঃশর্তে দান করছ তোমার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ; তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা। বাইশ বছর বয়সেই তোমাকে দেখাবে পঞ্চাশ বছরের বুড়ি। ভাগ্য খুব বেশি ভালো হলে হয়তো কঠিন ব্যাধিতে ধরবে না। আল্লা না করুক। হয়তো ভাবছ, হেসে-খেলে ফুর্তি করেই যখন দিন যাচ্ছে, যাক না। কী দরকার অন্য কাজকর্ম করে? কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না, এখন যা করছ, এর চেয়ে কঠিন কাজ পৃথিবীতে আর

নেই ; কোনোকালেই ছিল না। এরপর তোমাকে বরণ কতে হবে হে-মার্কেটের বাড়িওলিদের জীবন। মদ খেয়ে মাতলামো করে ঘুরে বেড়াতে হবে রাস্তায় রাস্তায়। বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে দেখে এসো, যাও। একবার একদল লোক ওইরকম এক মাতাল মেয়েলোকের সঙ্গে কী অমানুষিক, নিষ্ঠুর কৌতুক করেছিল, জানো? হয়তো একটু বেশি চেঁচামেচি করছিল। প্রচণ্ড তুষারপাতের ভিতর লোকগুলো তাকে বাসা থেকে বার করে দিল। ভাবল, খানিকটা বরফ মেখে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারপর কে আর কার খোঁজ নেয়! পরদিন সকাল নটায় তাকে বরফের স্তূপের তলা থেকে বার করল কয়েকজন গাড়োয়ান। তখনও সে মাতাল ; আলুথালু, অর্ধনগ্ন অবস্থায় বসে আছে একটুকরো রুটি হাতে। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সমানে চিৎকার করছে আর গাল দিচ্ছে ভাগ্যকে। তার চারপাশে ভিড় জমে উঠল ; শুরু হল রঙ্গ-রসিকতা। তুমি কি চাও, তোমার জীবনেরও ওই পরিণতি হোক? যেখানে আজ তুমি আছ, সেখানে আগে যারা এসেছে তাদের সবারই এই ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছে। সবাই এসেছে তোমার মতো কচি বয়সে ; অপাপবিদ্ধ, কোমল তনু-মন নিয়ে। তারাও জীবনের কুৎসিত পরিণতির কথা জানত না। সব কথায় লাল হয়ে উঠত। এমনকি যে মেয়েলোকটির কথা বললাম, সেও একদিন—ধরো আট কি দশ বছর আগে—তোমার মতোই ছিল। নিজেকে রানী ভাবত, কল্পনা করত, জীবনে একদিন রাজপুত্তুর আসবে ঘোড়ায় চেপে ; ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে। কিন্তু ভাটি বয়সে ওই নিঃসঙ্গ জীবনে পথের ওপর অর্ধনগ্ন অবস্থায় খাবারে কামড় দিতে-দিতে ওর কি একবারও মনে হয় নি বাপের বাড়ির নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবনের কথা? মাতলামোর ঘোরে একবারও কি মনে হয় নি পাশের বাড়ির সেই ছেলেটার কথা—যে তার স্কুলে যাবার পথে দাঁড়িয়ে থাকত একটিবার দেখার জন্যে, দুটি কথা বলার জন্যে; যে প্রতিশ্রুতি দিত, ওকে সারাজীবন ভালোবাসবে, সুখে রাখবে? না, লিসা, তার চেয়ে বরং যক্ষ্মায় ভুগে মরাই তোমার জন্যে ভালো হবে। হাসপাতালে মরার কথা বলছিলে না? সেও ভালো। কেউ যেন বস্তির অন্ধকার কুঠুরি থেকে তোমার মৃতদেহ বার না করে। যক্ষ্মা কিন্তু অদ্ভুত রোগ। জ্বরের মতো নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগীর আশা থাকে, সে ভালো হয়ে উঠবে। তো...তুমি যখন মারা যাবে, কাউকে কাছে পাবে না। কারণ তখন তো তোমার দেবার মতো কিছু থাকবে না। বরং লোকে গাল দেবে ঝামেলা বাধানোর জন্যে, অপেক্ষা করবে কবে মরবে তুমি, সেই সময়ের জন্যে। ভদ্রলোকেরা তোমাকে দেখে নাক সিঁটকাবে। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ঘরের কোণে ফেলে রাখবে তোমাকে। সেই নিঃসঙ্গ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কী ভাববে তুমি? যখন মারা যাবে, অচেনা-অজানা লোক তোমার সৎকার করবে নিদারুণ অবহেলায়। আহা-উহু করার লোকও পাবে না। ঝামেলাটা কত তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে নামানো যাবে—সেই চিন্তায় অস্থির থাকবে লোকে। তারা তড়িঘড়ি করে একটা কফিন কিনবে কবর দেবে জোড়াতালি দিয়ে তারপর তোমার স্মরণে শুঁড়িখানায়

ঢুকবে মদ খেতে। নোংরা, বরফ-ঢাকা, পানিতে-ভরা কবরে তোমার জায়গা হবে। এইসবই তোমার ভাগ্যে জুটবে। এভাবেই পৃথিবী থেকে তোমাকে বিদায় নিতে হবে। কিছুই থাকবে না। অন্য নারীদের স্বামী, সন্তান, বাপ-মা কবরের কাছে যাবে, তোমার কবরে তেমন কেউ যাবে না ; পৃথিবী থেকে মুছে যাবে তোমার নাম। কেউ দু-ফোঁটা অশ্রু ফেলবে না। কেউ ভাববে না তোমার কথা। তোমার জন্যে থাকবে শুধু নোংরা কাদামাটি। মৃতের পুনরুত্থানের জন্যে যতই কফিনের ঢাকনায় টোকা দাও, যতই চিৎকার করো, "ওগো ভালোমানুষেরা, একটু দয়া করো, আমাকে বাইরে নিয়ে যাও, পৃথিবীর আলো দেখতে দাও, আমার জীবন তো মানুষের জীবন ছিল না, এঁটো আবর্জনার মতো ফেলে দেয়া হয়েছে আমাকে, আমার জীবন উৎসর্গিত হয়েছে শুঁড়িখানায় মাতালদের স্মরণ উৎসবে, আমাকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দাও, একটু দয়া করো গো.. কোনো লাভ হবে না।'

গলা ধরে আসে। কথা থামিয়ে উঠে বসি। কী এক প্রত্যাশায় ঝুঁকে পড়ি। বুঝতে পারি, আমার হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে গেছে, ভয়ঙ্করভাবে ধুকপুক করছে বুকের ভিতরটা। অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগে আমার শরীরে।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই টের পাচ্ছিলাম, মেয়েটির মন আমূল ঘুরিয়ে দিয়েছি আমি। বিদীর্ণ করেছি তার হৃদয় । এই উপলব্ধি যতই দৃঢ় হতে লাগল ততই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলাম পাকা শিকারির মতো। তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইলাম খেলাটা। জানি, সেটা খেলা নয়, তবু।

বেশ ভালোভাবেই জানি ওকে যা বলেছি, সবই আমার মনগড়া। শক্ত সব কথা। হয়তো 'বইয়ের বুলি'র মতোই। কিন্তু তাতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। অনেক সময় এইসব বুলি ঠিকমতো ব্যবহার করা গেলে খুব কাজে লাগে। কিন্তু সাফল্যের প্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ মনে হল, ভীষণ ভয় পাচ্ছি। হতাশা এমন সাংঘাতিক হতে পারে, আগে জানা ছিল না। তাকিয়ে দেখি, বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মেয়েটি। দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছে বালিশ। তার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। উথাল-পাতাল কাঁপছে তার যৌবনবতী তনু। চাপা কান্না বুকে ধরে রেখেছিল, হঠাৎ ভেঙে পড়ল সে ; প্রথমে ফোঁপানি, তারপর উচ্ছ্বসিত, বাঁধভাঙা কান্না। বালিশদুটো আরও শক্ত করে বুকে ঠেসে ধরল সে। তখন সে কারুর সান্নিধ্য চায় না, সঙ্গ চায় না ; কাউকে দেখাতে চায় না তার বেদনা, তার নিষ্পাপ অশ্রু। প্রচণ্ড বেগে বিছানায় আঘাত করতে লাগল সে ; দু-হাত রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত থামল না। কখনও চুলের ভিতর আঙুলগুলো ঢুকিয়ে সজোরে টানতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঘষে চেষ্টা করল আত্মসংবরণের। একটা কিছু বলতে চাই তাকে, কিন্তু সাহস হল না। উঠে পড়লাম। আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে আমাকে। তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে। কিন্তু ঘোর অন্ধকারের ভিতর কাপড় পরে নেয়া খুব সহজ মনে হল না। হঠাৎ তার মধ্যে দেখি দৈব সাহায্যের মতো আমার হাতের কাছে পৌঁছে গেছে মোমবাতি

আর দেশলাই-বাক্স। আলো জ্বাললাম। লিসা উঠে বসেছে বিছানার ওপর। তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। বেদনায় বিকৃত হয়ে গেছে। প্রায় মূর্ছিতের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কান্নাভেজা, অপ্রকৃতিস্থ হাসি। ওর পাশে বসলাম। ওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরলাম। একটু ধাতস্থ হয়ে সে আমার কাছে ঘনিয়ে এল। জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস পেল না। ধীরে ধীরে আমার সামনে মাথাটা টেনে এনে নিচু করল।

'লিসা, লক্ষ্মীটি, আমি ভুল করেছি...মাফ করে দাও', ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম। কিন্তু সে শক্তভাবে আমার হাত চেপে ধরল। বুঝিয়ে দিল, এসব বলতে নেই। মাঝপথে থামলাম।

'ঠিকানা রইল, লিসা। তুমি আমার কাছে এসো।'

মাথা নিচু রেখেই সে বলল, 'আসব।'

'এখন যাই। আবার দেখা হবে।'

উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটিও উঠল। হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ। চেয়ারের ওপর থেকে টেনে নিল একটা শাল ; শরীরটা মুড়ে নিল তাই দিয়ে। ওই সময় লজ্জানত চোখে আবার একবার হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। আমি খুবই বিপন্ন বোধ করছি ; তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচি।

'একটু দাঁড়ান', পেছন থেকে আমার কোটের কলারে টান দিয়ে হঠাৎ বলল সে। মোমদানিটা নিচে রেখে ছুটে ভিতরে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি অপেক্ষায় থাকলাম। এর মানে কী? মিনিটখানেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিষম অবাক হয়ে গেলাম। এ সেই আগের লিসা নয় ; একেবারেই অন্য কেউ। তার চোখ থেকে বিমর্ষতা, অবিশ্বাস, অস্থিরতা চলে গেছে। তার বদলে প্রশান্ত মুখের ওপর জ্বলজ্বল করছে একজোড়া জীবন্ত, মায়াময় চোখ।

তার ধারণা, আমি অনেক উঁচুমানের মানুষ। সবকিছু ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝানোর দরকার হয় না। সে একখণ্ড কাগজ বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। তার মুখ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল, শিশুর মতো সজীব, যেন একান্ত বিশ্বাসভাজন কোনো বর্ষীয়ান আপন মানুষের কাছে সে তার অতি অমূল্য গোপন সম্পদ দেখাচ্ছে, এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। খুললাম কাগজটা। একটি প্রেমপত্র। মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র লিখেছে তাকে। যথেষ্ট শ্রদ্ধা, আবেগ আর ভালোবাসা-মেশানো সেই চিঠি। প্রেমিকের মনের সত্যিকার অনুভবের প্রমাণ আছে প্রতি শব্দে, বাক্যে। পড়া শেষ করে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম ; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে খানিকটা লজ্জা, খানিকটা গৌরব।

অল্পকথায় তাড়াহুড়া করে সে চিঠির ইতিহাস বর্ণনা করল। একটা বাড়িতে নাচের আসরে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার—কেমন করে যেন। তারা খুবই ভালোমানুষ, ওর সম্পর্কে 'কিছুই জানত না।' একেবারেই কিছু না। সারা সন্ধে ডাক্তারি-পড়ুয়া ছেলেটি ওর সঙ্গে নেচেছে। গল্প করেছে। কথায় কথায়

জেনেছি, রিগায় থাকাকালেই ছেলেটি ওকে চিনত, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে। তারপর অনেকদিন বাদে এই দেখা। ওর জীবনের 'পরিণতি সম্পর্কে কোনো খবর' তাদের কাছে পৌঁছয় নি। এটা তিনদিন আগের ঘটনা। তার পরদিনই এই চিঠি লিখেছে ছেলেটি।

কাহিনী শেষ করে উজ্জ্বল, লজ্জানত চোখ নামিয়ে নিল সে।

ওই চিঠি বেচারি মেয়েটির জীবনের পরম সম্পদ। সে আসলে আমাকে দেখাতে চেয়েছিল সে প্রমোদবালা হতে পারে, কিন্তু তার জীবনটা এত তুচ্ছ নয়। কেউ সত্যি তাকে ভালোবাসতে পারে। ভালোবাসার অধিকার থেকে এখনও সে বঞ্চিত হয় নি। জানি, এই চিঠির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এ প্রেমকাহিনী এখানেই শেষ। তবু মেয়েটি সারাজীবন যখের ধনের মতো আগলে রাখবে তার প্রথম (এবং হয়তো শেষ) প্রেমপত্র।...কিছু বললাম না, শুধু ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে আমার অনুভূতির কথা ব্যক্ত করলাম। তারপর চলে এলাম।

সারাপথ হেঁটে বাসায় ফিরলাম। তুমুল বরফ পড়ছে তখন—বড় বড় পেঁজায়। বিষম বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিত মনে হচ্ছে। তবু হাঁটতে থাকি। জীবনের একটি সত্য অন্তত খুঁজে পেয়েছি ; বিষণ্ন জঘন্য সত্য।

আট

এই সত্যটি মেনে নিতে অবশ্য বেশকিছুটা সময় লাগল। লম্বা ঘুম দেবার পর সকালে উঠে টের পাই, শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। গ্লানি আর অবসাদ কেটে গেছে। গতরাতে লিসার সঙ্গে যেসব আবেগাপ্লুত আচরণ করেছি সে-কথা ভেবে খুব অবাক লাগল। মাথা খারাপ হয়েছিল নাকি? সব কথাই একটু একটু করে স্মরণ করতে চেষ্টা করি। নাহ, ঠিকানাটা দিয়ে আসা একটুও ভালো হয় নি। যদি সত্যি চলে আসে মেয়েটা? তার চেয়ে বড় কথা ; জেভারকভ আর সিমোনভের চোখে ছোট হওয়া চলবে না। যে-কোনো মূল্যে ইজ্জত বাঁচাতে হবে। এইসব চিন্তাভাবনার ভিড়ে এক সময় লিসার কথা ভুলে গেলাম।

প্রথম কাজ সিমোনভের টাকা ফেরত দেয়া। যা থাকে কপালে—দুম করে গিয়ে ধরলাম আন্তন আন্তনিচকে। পনের রুবল ধার চাইলাম। আন্তন আন্তনিচের মেজাজপত্র ভালোই ছিল। এককথায় দিয়ে দিল টাকাটা। খুশিতে বাগবাগ হয়ে তাকে হোটেল ডি-প্যারিসের ঘটনা জানালাম। জেভারকভের পরিচয় দিলাম ; অন্য আপত্তিকর বিষয়গুলো এড়িয়ে বললাম, '...আধ ডজন এক্সট্রা বোতাল সাবাড় করে দিয়েছি।...'

সব ভালোয় ভালোয় চুকল। বাসায় ফিরেই চিঠি লিখলাম সিমোনভকে।

কীভাবে যে অত ভদ্র, সুললিত, রসঘন ভাষায় চিঠিটা লিখেছিলাম ভেবে

এখনও বিস্মিত হই। সেদিন যা–কিছু ঘটেছে সবকিছুর জন্য নিজেকেই দায়ী করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবার অনুরোধ জানালাম। লিখলাম, ওরা হোটেলে পৌঁছনোর আগেই একগ্লাস মদ গলাধঃকরণ করেছিলাম। তাতেই ওই বিপত্তি ঘটেছিল। আরও লিখলাম, মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলাম না, ফলে বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। সিমোনভ যেন আমার পক্ষ থেকে সবার কাছে মাফ চেয়ে নেয়।

চিঠি লেখা হয়ে গেলে আগাগোড়া পড়লাম। নিজেই নিজের তারিফ করলাম। 'চমৎকার কেতাদুরস্ত চালবাজি হয়েছে!' আসলে আমি তো একজন বুদ্ধিজীবী, সুসংস্কৃত মানুষ! মনটা খুশিতে ভরে উঠল। সব দোষ মদের, না?..আসল ব্যাপার তো আমিই জানি। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে, মানে, পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে কিছুই খাই নি। সিমোনভকে মিথ্যে বলেছি। নির্লজ্জ মিথ্যে। যাক, তাতে লজ্জার কিছু নেই। ঝামেলা থেকে তো বাঁচলাম!

চিঠির ভিতরে ছয় রুবল পুরে দিলাম, মুখ বন্ধ করলাম। তারপর অ্যাপোলনের হাতে দিলাম চিঠিটা সিমোনভের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য। চিঠির ভিতর টাকা আছে শুনে অ্যাপোলনের মুখে একটা সমীহ ভাব ফুটে উঠল। চিঠি নিয়ে যেতে তার আর আপত্তি নেই।

সন্ধের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। গতকালের সেই মাথা–ধরা, ঝিমঝিম ভাবটা তখনও আছে। কিন্তু যতই অন্ধকার ঘনিয়ে এল, টের পেলাম, আমার চিন্তাভাবনা পালটে যাচ্ছে, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। কী একটা সমস্যা মনের গহনে আঁকড়ে ধরে আছি কিছুতেই কাটাতে পারছি না। ক্রমেই বিষণ্নতা ঘিরে ধরছে আমাকে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম মিয়েশ্‌ত্‌চানস্কি স্ট্রিট, সাদোভি স্ট্রিট ধরে, ইউসুফভ গার্ডেনে গেলাম। সন্ধের দিকটায় এইসব জায়গা ভরে ওঠে অফিসফেরতা মানুষের ভিড়ে। তাদের মুখে ক্লান্তি আর দুর্ভাবনার ছাপ। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আজ সব কিছুতেই বিরক্তি লাগছে। বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে আমার। কী একটা গোলমাল বুকের ভিতর ফেনিয়ে উঠছে, তাড়া করে ফিরছে, শান্তি দিচ্ছে না। মেজাজ খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। কেবলই মনে হচ্ছে একটা জঘন্য অপরাধ করে ফেলেছি; বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি।

লিসা আসবে—এই ভাবনাটা ক্রমেই উদ্বেগ সৃষ্টি করছে আমার মধ্যে। অন্য সব দুর্ভাবনা কেটে গেছে। বিশেষ করে সিমোনভকে চিঠিটা লেখার পর থেকে যে অনাবিল স্বস্তি পেতে শুরু করেছিলাম, সেটা ছাপিয়ে উঠে আসছে এই নতুন ধরনের দুর্ভাবনা। এখন মনে হচ্ছে আমার একমাত্র সমস্যা লিসা। সত্যি যদি মেয়েটা চলে আসে, কী হবে? আবার মনে হচ্ছে, তা...আসুক না, ক্ষতি কী? কাল সে আমাকে নায়কের রূপে দেখেছে, আজ না হয় দেখবে অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত সমস্যাজর্জর মানুষ হিসেবে। না হয় দেখল। তাতে হয়েছেটা কী? না, ব্যাপারটা সাংঘাতিক। দামি হোটেলে ডিনার খেতে যাই, অথচ আমার ঘরে জীর্ণ

আসবাবপত্র, বসার ভালো জায়গা নেই, ড্রেসিং গাউনটা শতচ্ছিন্ন, এটা একটা কথা হল? তার চেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কথা, অ্যাপোলনের সঙ্গে তার দেখা হবে। জানোয়ারটা তো নিশ্চয় ওকে বেশ অপমান করবে। এইসব ঢাকার জন্য কত যে মিথ্যে বলতে হবে! জঘন্য! বীভৎস!

এইসব ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। মিথ্যে! কিসের মিথ্যে! কী এমন হাইকোর্ট দেখিয়েছি মেয়েটাকে? কাল ওকে যা বলেছি, তার মধ্যে নিজের বড়মানুষির কী ছিল? মনের কথাই তো বলেছি। নিজের বিশ্বাসের কথাই তো ওর মনে ঢোকাতে চেয়েছি। এই তো! ...মেয়েটা কেঁদেছে? কাঁদতেই পারে। তাতে আমার মিথ্যাচারের কী হয়েছে?

তবু সহজ হতে পারি না। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামে। আচ্ছা, লিসা তো নাও আসতে পারে আমার ঘরে। কেবল মনের ভিতরেই তার আসা-যাওয়া চলছে। তার সেই ফুলে-ফুলে ওঠা কান্না, আধো-হাসি, আধো-গম্ভীর মুখ—কিছুই মন থেকে তাড়াতে পারছি না। হয়তো কোনোদিনই পারব না পনের বছর পরেও না।

পরদিন সকালে মনে হল, আসল সমস্যা আমার স্নায়বিক দুর্বলতা। সব ছোটখাটো সমস্যাকে আমি বড় করে ধরি। খামোকা দুর্ভাবনার ভারে নুয়ে পড়ি। শেষ পর্যন্ত সব বুদ্ধি-বিবেচনা ছাপিয়ে আবার একটা আশঙ্কা জয়ী হয় লিসা আসবে। আমি মনে মনে চিৎকার করে উঠি। লিসা আসবেই। ও ঠিকই খুঁজে বার করবে আমাকে। পোড়া মনটাই যত ঝামেলা বাধিয়েছে। কে বলেছিল অমন দুর্বল হয়ে পড়তে! মূর্খের মতো আবেগের মুহূর্তে কী সর্বনাশটাই যে বাধিয়েছি! এখন এর হাত থেকে আর আমার পরিত্রাণ নেই। কিছুতেই না।

প্রবল অনিশ্চয়তা আর গোলকধাঁধায় হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

একবার এমনও মনে হল, যাই, মেয়েটাকে বলে আসি, যা বলেছি সব ভুল। ঘোরের মধ্যে বলেছি। সে যেন না আসে। ভাবতে ভাবতে ক্রমে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠি। আসুক না, দেব ছুঁড়ির মুখে এক থাপ্পড়। অপমান করব। ঘাড় ধরে বার করে দেব।

আরও একদিন গেল। আরও একদিন। তারপর আরও কয়েকদিন। সে এল না। ঠাণ্ডা হল মনটা। অন্য ধরনের কথা ভাবতে শুরু করলাম। রাত নটা বাজতেই মনের জানালা ধরে দেয় উঁকি দেয় হতভাগিনী। কখনও স্বপ্নে, কখনও জাগরণে তাকে দেখি। সে আমার কাছে এসেছে। তাকে আমি দর্শন শেখাচ্ছি। পড়াচ্ছি। মানুষ করে তুলছি—আমার মতো মানুষ। এভাবে এক সময় টের পাই, সে আমাকে ভালোবাসে। উন্মত্তের মতো ভালোবাসে। আমি না-বোঝার ভান করি। (কেন ভান করি, জানি না।) এক সময় স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে আমার হাতে ধরা দেয় সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো। গাঢ় স্বরে জানায়, আমি তার উদ্ধারকর্তা। আমিই তাকে বাঁচিয়েছি। পৃথিবীতে আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। আমি মুগ্ধ হই।

বলি, 'লিসা, জানো না, আমি তোমার প্রেম টের পাই নি। যখন পেলাম তখন এল দ্বিধা। কীভাবে প্রকাশ করি নিজের মনের কথা? তোমার মন কুসুমের মতো কোমল। কোনোভাবে যদি ব্যথা দিই, কষ্ট দিই তোমাকে, কীভাবে নিজেকে ক্ষমা করব, বলো? কিন্তু এখন তো জেনেছি, তুমি আমার। আমিই তোমাকে রচনা করেছি আপন মনের মাধুরী দিয়ে। তুমি পরিপূর্ণা। তুমি অপাপবিদ্ধা। তুমি সতী, তুমি আমার লক্ষ্মী বউ।

এসো আমার ঘরে

স্বপন দুয়ার খুলে এসো অরুণ আলোকে

মুগ্ধ এ চোখে।

ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে।'

তারপর 'টোনা-টুনি সুখে বাস করিতে লাগিল' আর কি। আমরা বিদেশ ভ্রমণে গেলাম। এভাবে চলল। শেষের দিকে দেখি, অশ্লীল সব কল্পনা এসে যাচ্ছে। তখন আত্মসংবরণ করতে বাধ্য হই। তাছাড়া ব্যাপারটা নিশ্চয় অত সহজ হবে না। ওরা কি মেয়েটিকে বেরুতে দেবে? বিশেষ করে সন্ধেয়? আমি সবসময় কল্পনায় দেখি, সন্ধেবেলা, বিশেষ করে সাতটার দিকে সে এসেছে। যদিও মেয়েটি বলেছে, সে ওখানে বন্দিনী নয়। তবু...চলে আসাটা কি সহজ হবে? ধেৎ, আসবেই সে। না এসে পারে না।

মাঝে মাঝে এই দিশাহারা অবস্থা থেকে আমাকে মুক্তি দেয় অ্যাপোলন। খুবই রূঢ় আচরণ করে। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। সে আসলে আমার জীবনের মূর্তিমান অভিশাপ। বছরের পর বছর এই অভিশাপ আমাকে টেনে বেড়াতে হচ্ছে। এত যে ঝগড়া হয়, এত যে গালমন্দ করি, তবু তাকে ছাড়তে পারি না। তার অবশ্য বয়স হয়েছে। শুধু যে আমার বাড়িতে কাজ করে খায়, তা নয়। তার অন্য পেশাও আছে। অবসর সময়ে দরজিগিরি করে টুকটাক উপার্জন করে। একেবারে ফেলনা নয় সে। তবু তাকে দেখতে পারি না। তার দিকে তাকালেই গা জ্বালা করে। পুরু কাচের চশমা পরে ; জবুথবু বুড়োর মতো। উলটোদিকে চুল আঁচড়ায়। একখাবলা তেল মাখে রোজ। সেই তেল তার কপাল বেয়ে গড়ায়। এরকম অদ্ভুত চরিত্র আর দেখি নি। কিছু বিদ্যে আছে, কিন্তু নিজেকে অসম্ভব পণ্ডিত জ্ঞান করে। তার মতো দেমাগ বুঝি এক আলেকজান্ডারেরই শোভা পায়। কোটের সবকটা বোতামের সঙ্গে তার প্রেম ; হাতের প্রত্যেক আঙুল, আঙুলের নখ তার কাছে যখের ধন। মনে মনে সে যে অতি অত্যাচারী, কোনো সন্দেহ নেই। এমন একটা বাহাদুর-মার্কা আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় যে, আল্লার কিরে, গা জ্বলে যায়। আমার কাজগুলো করে কত যেন ধন্য করে দিচ্ছে। ভাব দেখায়, এসব করতে সে একটুও বাধ্য নয়। অথচ মাসে সাত রুবল বেতন—এইটে আদায় করতে কখনও ভুল হয় না। আমাকে যা যন্ত্রণা দিয়েছে তাতে আমার সাতপুরুষের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবার কথা। মাঝে মাঝে লোকটার অস্তিত্ব

এতটা অসহনীয় হয়ে ওঠে যে তার পায়ের শব্দ শুনলেই আমার শরীর কাঁপতে থাকে। সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার তার ওই শিশুর মতো অস্ফুট উচ্চারণ-ভঙ্গি। সন্ধেবেলা যখন তো-তো করে বাইবেল আওড়ায়, তখন রাগে দিশাহারা হয়ে যাই, ভাবি, লাগাই কষে থাপ্পড়। এ-নিয়ে কম ঝগড়া করি নি। কিন্তু ওই গুনগুনানি তার এত প্রিয় যে কিছুতেই ছাড়বে না। তার প্রার্থনাসঙ্গীত শুনে আমার কেবলই মনে হয়, বাড়িতে একটা মড়া পড়ে আছে, আর তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য চলছে দোয়া। ওই একঘেয়ে, ভয়ঙ্কর অসহনীয় সুরে বাইবেল পড়তে-পড়তেই সে রান্নাঘরের ইঁদুর মারে, জুতো পালিশ করে। আমি তাকে তাড়াতে চাই, সে যায় না। আমার বাসায় সুখ নেই। ছোট বাসা। আধুনিক সুবিধে নেই। এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত কারাগার। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। গোপন গুহা। এখানে আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখি, গুটিয়ে রাখি—আড়াল করে রাখি মানবসমাজ থেকে। তবু অ্যাপোলন যাবে না। এই বাসার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে সে। সাতবছর চেষ্টা করেও তাকে তাড়াতে পারি নি।

বেতন দিতে দু-তিনদিন দেরি হলে বড়ই উৎপাত বাধায় সে। আমিও মাঝে মাঝে অহেতুক ঝামেলা করি, কেবল তাকে 'শাস্তি' দেবার জন্য। সব সময় অপেক্ষা করি—যতক্ষণ সে নিজমুখে বেতনের কথা না বলে। তারপর একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ড্রয়ার থেকে বার করে দিই। তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, আমি প্রভু ; সে ভৃত্য। প্রভুর কিছু শ্রদ্ধা পাওনা আছে। সে যদি শ্রদ্ধা দেখাত, বেতন নিয়ে ঝামেলা হত না।

তার চালাকি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। সে জেনে গেছে, শেষ পর্যন্ত আমারই হার হবে। তাই সে সযত্নে নিজেকে আমার চোখের আড়াল করে রাখে। কোনো দরকার হলে ভদ্রতা-সৌজন্যের ধার ধারে না ; অনুমতিও নেয় না, আমার কামরায় ঢুকে পড়ে। তার এক বিশ্রী ভঙ্গি আছে দৃষ্টি আকর্ষণের। দু-হাত পিঠে বেঁধে এক-পা সামনে বাড়িয়ে দাঁড়ায়। অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি জিজ্ঞেস করি, তার কী চাই, উত্তর দেয় না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। তারপর ঠোঁট মুচড়িয়ে বিড়বিড় করে কী বলে, কার বাপের সাধ্য বোঝে। তখন আমি বাধ্য হই খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে। যদি না করি সে বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুরু করে। ভাবখানা এই, কবে যে তার ছেলেমানুষ প্রভুর সুবুদ্ধির উদয় হবে!

সেদিনও সে চিরাচরিত অভ্যেস অনুযায়ী একটা ঝামেলা বাধাল। শুয়ে বই পড়ছি, সে তার বিশেষ পরিচিত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাই?' উত্তর না দিয়ে একই নিয়মে সে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

চিৎকার করে উঠলাম, 'দাঁড়াও। দাঁড়াও বলছি।'

সে নির্বিকারমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়! সাহস বেশি হয়ে গেছে?'

আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'দাঁড়াও! এক-পা নড়বে না। কথার উত্তর দাও। কেন এসেছ?'

'যদি কোনো হুকুম করেন, তামিল করব, আর কী?'

'চালাকি পেয়েছ? তাহলে আমি নিজেই বলছি, কী চাও। বেতন চাইতে এসেছ। কিন্তু এত দেমাগ যে তা মুখে বলতে চাও না। এগুলো হচ্ছে শয়তানি...শয়তানি....শয়তানি ....শয়তানি।'

আবার পা বাড়াতে গিয়েছিল, তার আগেই বললাম, 'এই যে তোমার বেতন। পুরো সাত রুবল। কিন্তু এখন পাবে না। আমার পায়ে পড়বে, মাফ চাইবে, তারপর। বুঝতে পেরেছ?'

'তা তো হয় না', অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে বলল।

'তা-ই হবে', আমি বললাম, 'আল্লার কিরে, তা-ই হতে হবে।'

আমার কোনো কথা যেন তার কানে পৌঁছয় নি, এমন ভঙ্গিতে সে বলল, 'আপনার পায়ে ধরার কী হয়েছে? বেশি ঝামেলা করলে সোজা গিয়ে থানায় খবর দেব। আপনি নির্যাতন করছেন।'

'যাও, পুলিশ ডাকো', গর্জে উঠলাম। 'এক্ষুনি যাও, এই মুহূর্তেই যাও! দেখি তোমার কত বাড় বেড়েছে।'

কিন্তু কোনো কথাই যেন তার মাথায় ঢোকে নি। শান্ত স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে নিজের কামরায় চলে গেল সে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। তার দরজার পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাগে কাঁপছি, তবু নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করলাম।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলি, 'অ্যাপোলন, এক্ষুনি যাও। পুলিশ ডেকে নিয়ে এসো।'

ততক্ষণে সে আরও নিরীহ, শান্তভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়েছে। চশমা এঁটে নিয়েছে চোখে। কাপড় সেলাই করবে।

'এক্ষুনি। একমিনিটও দেরি করা চলবে না। যাও, পুলিশ নিয়ে এসো। নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে, ভাবতেই পারবে না, আমি কী করব।'

'আপনার মন আজ খুব খারাপ', মাথা না-তুলেই অ্যাপোলন বলল, 'নিজের জন্যে কেউ আবার পুলিশ ডাকতে পাঠায় নাকি?'

অ্যাপোলনের কাঁধ আঁকড়ে প্রবল ঝাঁকুনি দিলাম। 'যাবে কি যাবে না?' মেজাজ ঠিক রাখা দায় হচ্ছিল। আর-একটু হলেই ওকে মেরে বসতাম।

ঠিক এইসময় প্যাসেজের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল একটি শরীর। আমাদের কাছাকাছি এসে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার দিকে একপলক তাকিয়ে আমি লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলাম। ছুটে চলে গেলাম নিজের ঘরে। চুলের ভিতর আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ।

দু-মিনিট পর কাছেই অ্যাপোলনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। 'কে এক

মেয়েলোক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। সে তীক্ষ্ণচাখে আমাকে জরিপ করতে শুরু করল। তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না-করে দরজা খুলে ধরল। ঘরে ঢোকে লিসা। অ্যাপোলন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মহা-কৌতূহলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

'যাও! চলে যাও!' বেপরোয়া ভঙ্গিতে আমি গর্জে উঠলাম। সেই মুহূর্তে আমার অ্যালার্ম ঘড়ি বেজে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ গোঙানিতে। সাতটা বাজে।

নয়

'এসো আমার ঘরে—
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে।'

বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু আগে বিষম বিষণ্ণতার ঘোরে যেমন কল্পনা করেছি, ঠিক তারই দৃশ্যায়ন দেখছি যেন সামনে। মৃদু হেসে শরীরে টেনেটুনে নিই পরনের জীর্ণ পোশাক। দু-মিনিট আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অ্যাপোলন চলে গেল। কিন্তু তাতে আমার অস্বাচ্ছন্দ্য কাটল না। মেয়েটিও খুবই বিভ্রান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে—এতটা অবাক হবে, ভাবি নি।

কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো বললাম, 'বসো।' চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম টেবিলের দিকে। আমি সোফায় বসলাম। বাধ্য মেয়েটির মতো সে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে বসে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। এই প্রত্যাশা আমার ভালো লাগল না। রাগ হল। কিন্তু মনোভাবটা চেপে বসে রইলাম।

তাকে দেখে মনে হল, 'সবকিছুর' জন্য সে একটা বড় প্রাপ্তির আশা করছে।

'আমাকে এ-অবস্থায় দেখবে, আশা করো নি, তাই না?' বাধো-বাধো স্বরে শুরু করলাম। জানি, এভাবে কারুর সঙ্গে কথা শুরু করার নিয়ম নেই। মেয়েটির মুখে লালিমা লক্ষ করি। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না, বিব্রত হবার কী আছে? দারিদ্র্যের জন্যে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই...বরং দরিদ্র বলে আমার খানিকটা গর্বই আছে। গরিব হতে পারি, কিন্তু সম্মানের তো অভাব নেই। যাক গে...চা খাবে?'

'না।'

'একমিনিট বসো।'

উঠে অ্যাপোলনের কাছে যাই। হঠাৎ কেন যেন বাইরে যাবার তাগিদ বোধ করছিলাম।

'অ্যাপোলন', হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'এই নাও তোমার বেতন। কিন্তু দেখো, আমার মান-সম্মান ডুবিয়ে দিয়ো না। রেস্তরাঁ থেকে চা আর খাবার নিয়ে এসো। ওই মহিলা কিন্তু হেঁজিপেজি না। যদি না-যাও, বড্ড বিপদে পড়ব।...হয়তো ভেবে সারা হচ্ছ...কিন্তু ওই মহিলা....আমার সব।'

অ্যাপোলন আমার দিকে তাকাল না। কথাগুলো শুনেছে কি না—তাও বুঝলাম না। সে আপনমনে যা করছিল, করতে থাকল। আমি দিগ্বিজয়ী বীর 'নেপোলিয়নের' ভঙ্গিতে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘামে আমার বুক ভিজে যাচ্ছে। খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে টাকাগুলো তুলে নিল। গুনল। তারপর বেরিয়ে গেল। একবার ভাবলাম, পোশাকটা পালটানো দরকার। পরে আবার মনে হল, যা হয় হোক, এতেই চলবে। আবার গিয়ে বসলাম লিসার কাছে। অস্বস্তির সঙ্গে সে আমার দিকে তাকাল। বেশকিছুটা সময় নীরবে কাটল।

'ওকে খুন করব আমি', হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম, সজোরে ঘুসি মারলাম টেবিলে। দোয়াত ছলকে খানিকটা কালি পড়ে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে সে বলল, 'কী বলছেন?'

'খুন করব, খুন!' সহসা উন্মত্তের মতো টেবিল চাপড়ে চেঁচাতে শুরু করলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, পাগলামি হয়ে যাচ্ছে। 'তুমি জানো না, লিসা, ওই লোকটা কী যন্ত্রণাই দিচ্ছে আমাকে।...খাবার আনতে পাঠিয়েছি...।'

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কাঁপুনি আসছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো। কাঁদতে বিষম লজ্জা করে, কিন্তু উপায় নেই। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে।

মেয়েটি মমতা-জড়ানো স্বরে বলল, 'কী হয়েছে আপনার?'

'পানি ...একটু পানি দাও আমাকে ওই যে, ওখানে আছে', ধরা গলায় বললাম। বুঝতে পারছি, পানি ছাড়া এই মুহূর্তে ধাতস্থ হতে পারব না।

পানি খাইয়ে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। অ্যাপোলন চা নিয়ে এল। বাসার পরিবেশ, মামুলি চা-নাশতা——সব যেন আমার ব্যক্তিত্বকে বিষম ব্যঙ্গ করছে। আমি সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি যেন। লিসা নীরব দৃষ্টিতে অ্যাপোলনকে সতর্ক করতে চাইল। আমাদের কারুর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল অ্যাপোলন।

লিসা কী ভাবছে জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করি, 'আমার ওপর করুণা হচ্ছে?'

লিসা স্তম্ভিত হয়ে আমার দিকে তাকাল ; কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'চা খাও', ঝাঁজালো স্বরে বললাম। হঠাৎ বিষম রাগ হচ্ছে ওর ওপর। আসলে নিজের ওপরই যে রাগ জন্মাচ্ছে সেটা গিয়ে পড়ছে ওর ওপর। এত রাগ হচ্ছে যে যে-কোনো সময় ওকে খুন করে ফেলতে পারি। এইসব অশান্তির একমাত্র কারণ তো ওই মেয়েটিই।

পাঁচমিনিট সবাই চুপ করে রইলাম। চা টেবিলের ওপর পড়ে থাকল। কেউ স্পর্শ করলাম না। মেয়েটির বুকের তলায় অনেক কথা ভরা রইল ; বলতে পারছে না। আমার অস্বাভাবিক নীরবতা নিরাশ করেছে তাকে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য আমার ভীষণ অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে কী করা দরকার—আমি জানি না।

'আমি...ওখান থেকে...ইয়ে....চলে আসতে চাই', অনেক কষ্টে প্রায় নিঃশব্দে বলল লিসা। বোকা মেয়েটা জানে না, সব কথা সবসময় বলতে নেই। ওই রাগের মুহূর্তে কথাটা শুনে মেজাজ নতুন করে খারাপ হয়ে গেল। আমি চুপ করে থাকলাম। ওকে সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করছি না। আমি নিশ্চয় নির্বোধ। কিন্তু পৃথিবীর সবাই আমার সঙ্গে নির্বোধ আচরণ করবে নাকি?

আরও পাঁচমিনিট নিঃশব্দে কাটল। মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'আপনাকে বোধ হয় দেরি করিয়ে দিচ্ছি।'

বলেই উঠে পড়ল সে। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে এসেছ কেন, বলবে না?'

উত্তর না-পেয়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। 'কেন এসেছ, বলো। তা হলে আমি বলব? ওই যে এক দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে কিছু আবেগের কথা বলে ফেলেছি, তুমি এখন সেই আবেগে মাখনের মতো নরম হয়ে গেছ। তাই ছুটে এসেছ, যদি আমাকে আরও খানিকটা গলাতে পার, তাই। কিন্তু আসল কথাটা কী, জানো? তখন মনে মনে আমি খুব হাসছিলাম। এখনও হাসছি। কাঁপছ কেন? কী হয়েছে? সত্যি কথাই বলছি। আমার খুব হাসি পাচ্ছে। ওইদিন সন্ধেবেলা আমাকে খুব অপমান করা হয়েছিল। যারা অপমান করেছিল, তাদের একজনকে ধরার জন্যে তোমার ওখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে পাই নি। তার বদলে তোমাকে পেয়েছিলাম। সেই প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলে তুমি। আমি লাঞ্ছিত হয়েছি, তাই অন্যকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছি। প্রমাণ করতে চেয়েছি, আমারও কিছু ক্ষমতা আছে। অথচ তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে উদ্ধার করার অভিযানে তোমার ঘরে গেছি। তাই ভেবেছ, না? কী বলো, অ্যাঁ? তাই তো ভেবেছিলে?'

ধারণা করেছিলাম, মেয়েটি এইসব কঠিন কথায় তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। সবটা বুঝতেই পারবে না। কিন্তু ধারণাটা যে ভুল ছিল, ওর মুখের দিকে তাকিয়েই টের পেলাম। রুমালের মতো সাদা হয়ে গেছে সেই মুখ। কী যেন বলতে চাইল। কিন্তু অতি কষ্টে শুধু ঠোঁটজোড়া কাঁপানো ছাড়া আর কিছু পারল না। গোড়া কেটে দিলে গাছ যেমন ধরাশায়ী হয়, তেমনি করে ঝুপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে ঘরময় পায়চারি করলাম দ্রুতবেগে। 'উদ্ধার? উদ্ধার করব তোমাকে? আমাকেই কে উদ্ধার করবে, ঠিক নেই। কেন এসেছ তুমি? আমি কী করতে পারি? কেনই বা করব? আমি তো শুধু ক্ষমতা দেখাতে

চেয়েছি! ক্ষমতা। ঠিকানাটা তোমাকে দিয়ে এসেছি বলে পরে নিজের হাত কামড়েছি, জানো? আমি তো কেবল একটা খেলা খেলেছি। আর কিছুই না। আসলে তোমাকে...তোমাদেরকে আমি ঘৃণা করি। আমি কথার জাল বুনে তোমাকে স্বপ্নের ফাঁদে ফেলেছি। তোমরা জাহান্নামে গেলে আমার কী? আমি চেয়েছি একটু শান্তি। শান্তির জন্যে এই পৃথিবী বিক্রি করে দিতেও আমার অসুবিধে নেই। দুনিয়া রসাতলে যাক, তাই বলে আমি ভাতে মরব নাকি? সন্দেহ নেই, আমি ইতর, অসভ্য, নীচ, অহংসর্বস্ব মানুষ। তিনদিন ধরে এই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, কখন আবার তুমি এসে পড়ো। তুমি তো জেনেছ আমি তোমার উদ্ধারকর্তা ; বীরপুরুষ। আমার এই হাঁড়ির হাল দেখে কী ভাববে, আমি জানি না? কোথায় যাবে আমার সেই নায়কোচিত ভাবমূর্তি? একটু আগেই তোমাকে বলেছি, দারিদ্র্যের জন্যে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, দারিদ্র্যের জন্যে আমার যথেষ্ট সঙ্কোচ আছে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেও এত সঙ্কোচ হত না। বুঝতেই পারছ, নায়ককে এই হতকুচ্ছিৎ পরিবেশে দেখতে এসে তুমি কঠিন অপরাধ করেছ। তোমার এই অপরাধের ক্ষমা হয় না। তুমিও...শেষ পর্যন্ত তুমিও আমাকে অপমান করেছ। আমি কোনোদিন ভুলব না। কোনোদিন না। এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে অপমানিত, লাঞ্ছিত, দুর্ভাগ্যবান আর কে? তুমি আরও অপমান যোগ করলে। আরও লাঞ্ছনা দিলে। তোমার জন্যে আরও বড় দুর্ভাগ্য বরণ করতে হল আমাকে। তুমি জাহান্নামে যাও, আমার কী? তুমি আমার কী ক্ষতি করেছ কল্পনাও করতে পারবে না।...আর কী চাও? কেন এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যাচ্ছ না কেন?'

এরপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আমি জানতাম, বিস্তর বইপুস্তক পড়ে বিদ্যে গিজগিজ করছে মাথায়, তাই অনেককিছু চট করে বুঝতে পারি। কিন্তু ওই অর্ধশিক্ষিতা দুর্দশাগ্রস্তা মেয়েটিও আমার মনের কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে, কখনও ভাবা যায়? কিন্তু লিসা সবই বুঝল। মানব-হৃদয়ের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলো কি নারীই আগে বোঝে? কীভাবে বোঝে? কে তাকে বুঝিয়ে দেয়? প্রেম?

অপমানিত, বিধ্বস্তমুখে লিসা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। তারপর তার মুখ থেকে অপমান-লাঞ্ছনার ছায়া সরে গিয়ে জমে উঠল বেদনা আর সহানুভূতির রং।

কথার প্রাবল্যে হোক, কিংবা অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায়ই হোক, আমার চোখ থেকে যখন দরদর করে অশ্রু নামছে, লিসা তার সব আতঙ্ক-বেদনা-অপমান ভুলে আমার কাছে ঘনিয়ে এল ; হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে চাইল। আমি তো তখনও আত্মস্থ হতে পারি নি। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যেতে চাও না?'

ভেবেছিলাম, হাত সরিয়ে নেবে কিন্তু আরও নিবিড়ভাবে কাছে এসে দাঁড়াল সে। দু-হাত তুলে দিল আমার কাঁধে তারপর জলোচ্ছ্বাসের মতো অবাধ্য, প্রতিরোধ্য কান্নায় ভেঙে পড়ল।

লিসার শক্ত আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সোফায় বসে পড়লাম। নোংরা, ভাঙা সোফা। ছেঁড়া কাপড়। সেখানে লিসাকে বসতে বলা যায় না। সে কান্নার প্রথম আঘাত সামলে আমার কাঁধে হাত রাখল। বারবার চোখ মুছতে থাকল। আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না; সব শক্তি–সাহস হারিয়ে ফেলেছি। কিসের সঙ্কোচ, কিসের লজ্জা, তাও জানি না। কেবল একটা সত্য আমার বুকের গভীর গোপনে সাবধানে দানা বাঁধছে। সেটা হল এতদিন, মানে গত চারদিনে আমি ছিলাম নায়ক ; কোনো নায়িকা ছিল না। কাহিনীর পুরো পটভূমি বদলে গেছে। এখন ওরই জিত। ও এখন নায়িকা। নায়ক আর নেই। আরও একটা সত্যের অস্তিত্ব টের পাই : আমি ওই নায়িকাকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছি।

সে–ঈর্ষা প্রতিহিংসা পর্যন্ত গড়াল। হঠাৎ আমি থ্যাঁতা ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করলাম যেন। ডুবন্ত মানুষ কি খড়কুটা আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় না? বিকল্প প্রভুত্ব, বিকল্প শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষীণ আলো আমার মনে ঝলসে উঠল। আমি প্রবল আবেগে তার হাত আঁকড়ে ধরলাম। প্রথমে আঁতকে উঠেছিল ও, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর সমান উষ্ণতায়, সমান প্রাবল্যে আঁকড়ে ধরল আমার শরীর।

দশ

পনের মিনিট অস্থিরভাবে পায়চারি করলাম ; মিনিটে মিনিটে পর্দার কাছে যাচ্ছি আর উঁকি দিয়ে লিসার অবস্থা লক্ষ করছি। বিছানার কিনারে মাথা রেখে মেঝের ওপর বসে আছে সে। কাঁদছে নিশ্চয়। সে যে চলে যাচ্ছে না—এই ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর মনে হল। এতক্ষণে তার কিছু বুঝতে বাকি নেই। আমি তাকে চূড়ান্ত অপমান করেছি। কিন্তু...থাক, সে বিবরণে আর কাজ নেই। নিশ্চয় সে বুঝেছে আমি শুধু আমার প্রতিহিংসাই চরিতার্থ করেছি। যে প্রবল ঘৃণা থেকে এই উন্মত্ততার শুরু, ব্যক্তিগত ঘৃণার মধ্যেই ইতি ঘটেছে তার। অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি না, সবটুকু সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এটুকু তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমি অতি জঘন্য লোক ; তাকে ভালোবাসার যোগ্যতা আমার নেই।

জানি, সবাই বলবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটাও বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে আমি তার সঙ্গে প্রেম করব কিংবা তার ভালোবাসার মূল্য দেব। আজকাল একটা কথা প্রায়ই মনে হয়, আমি ভালোবাসতে শিখি নি। ভালোবাসা বলতে আমি শিখেছি প্রেয়সীর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা। জীবনে ভালোবাসার কোনো অর্থের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। মনে হয়, ভালোবাসা আসলে প্রেমের পাত্রটির ওপর পূর্ণ অধিকার, অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব, তার ওপর উৎপীড়ন।

গোপন স্বপ্নের মধ্যেও আমি জেনেছি ভালোবাসা আসলে লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। ঘৃণা দিয়ে যার শুরু আর অতৃপ্ত অমীমাংসিত বোধ দিয়েই সমাপ্তি। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে নিজেকে নষ্ট করার অপার্থিব আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য দিয়ে 'সত্যিকার জীবনকে' ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি। ভেবেছি, প্রেয়সী শুধু আমার সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পাবার জন্যই আমার কাছে এসেছে। ওর যে ভালোবাসা পাবার অধিকার আছে আর সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, একবারও মনে হয় নি। মনে হয় নি, একজন নারীর কাছে ভালোবাসা শুধু সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি নয়, অনেক বেশি কিছু, সে ধ্বংসের সীমানায় দাঁড়িয়ে ত্রাণের জন্য ভালোবাসা চেয়েছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখতে দেখতে অবশ্য মনে হচ্ছিল, ওর প্রতি বিশেষ কোনো ঘৃণা জন্মায় নি আমার মনে। শুধু ওর ওইভাবে বসে থাকা দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ওর চলে যাওয়া উচিত। আমার দিক থেকে আর কোনো অপমান ওর পাওনা নয়। আমি শান্তি চেয়েছি ; স্বস্তি চেয়েছি। আমি ফিরে যেতে চেয়েছি আমার গোপন জীবনে, একা থাকতে চেয়েছি। এই নতুন জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার দম আটকে আসছিল।

অনেকটা সময় এভাবে গেল। নড়াচড়া না-করে মেয়েটি ওভাবেই বসে আছে। জ্ঞান হারাল নাকি? লজ্জার মাথা খেয়ে মৃদু শব্দ করলাম। যেন মনে করিয়ে দিতে চাইলাম, এবার ওর ওঠা উচিত। দম-ছাড়া কলের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠল সে। ক্ষিপ্রগতিতে তুলে নিল রুমাল, টুপি আর কোট। এবার সে পালাবে আমার সামনে থেকে। দু-মিনিট পরেই সে বেরিয়ে এল পর্দার আড়াল থেকে। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি দেঁতো হাসি-হেসে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। চোখ নামিয়ে নিলাম।

'চলি', দরজার দিকে পা বাড়িয়ে সে বলল।

আমি তার কাছে ছুটে গেলাম, তার হাত আঁকড়ে ধরলাম। হাতের ভিতর কিছু একটা গুঁজে দিয়ে মুঠো বন্ধ করে দিলাম। তারপর তাড়াহুড়া করে ফিরে এলাম ঘরের অন্য কোনায়, বিদায়ের মুহূর্তে ওর চোখের দিকে তাকানোর সাহস আর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি আমি।

এখানে একটা কথা বলার লোভ সামলাতে হচ্ছে আমাকে। বলতে পারতাম, সবই ঘটেছে ঘটনাক্রমে, ঘোরের মধ্যে, এসব সত্যি কিছু চাই নি। কিন্তু কী হবে মিথ্যে বলে? বলব যখন, সবই সত্যি বলব। ওর হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছি...ঘৃণায়। না, মন থেকে এই বিশ্রী কাজের কোনো সমর্থন পাই নি। যা করেছি, সবই মস্তিষ্কের নির্দেশে। সেই একই নির্দেশে যন্ত্রের মতো আবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃদু শব্দে ডাক দিলাম—'লিসা! লিসা!'

উত্তর পেলাম না। তার পায়ের শব্দ পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে যাচ্ছে।

আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'লিসা!'

চলে গেছে লিসা। দরজা কঁকিয়ে উঠে বিষম শব্দে বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিধান্বিত

পায়ে ঘরে ফিরে এলাম। বিষণ্ন বোধ করছি।

টেবিলের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই চেয়ারটি স্পর্শ করলাম, যেখানে বসে সে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। একমিনিট গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম প্রবলভাবে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা দোমড়ানো পাঁচ রুবলের নোট, যেটা তার হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম।

ভালোই হল। এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সত্যি আমি কি এর জন্য অপেক্ষা করেছি? আমি তো অহংসর্বস্ব মানুষ। একজন সঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধার যথেষ্ট অভাব আছে আমার। ভাবি নি, টাকাটা সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে আমার কী যেন হয়ে গেল। ক্ষিপ্রগতিতে কাপড় পালটে নিয়ে একছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। উন্মত্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত পাখির মতো ওকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম—রাস্তার পর রাস্তা, গলির পর গলি। এইটুকু সময়ের মধ্যে আর কতটুকু পথ পাড়ি দেবে সে? বড়জোর দু শ কদম?

বাইরে সব শান্ত। প্রবল বরফ পড়ছে, ঢেকে যাচ্ছে ফুটপাত-রাস্তা ঘরবাড়ি। বালিশ ফেটে গেলে যেমন চারদিক তুলোয় ভরে যায়, তেমন করে বরফে ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। রাস্তায় কেউ নেই। কিছু নেই। কোনো শব্দও শোনা যায় না। অসহায়, নির্বিকার চোখে বাতিগুলো তাকিয়ে আছে পথের পাশে। আমি একবার এদিক যাই, একবার ওদিক। কেউ কোথাও নেই। এই প্রবল দুর্যোগের রাতে কোথায় গেল হতভাগিনী? আর আমিই বা কেন তাকে খুঁজে মরছি?

কেন? তার সামনে গিয়ে নত হব? আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ব? চুমু খাব তার মলিন পদযুগলে? ক্ষমা চাইব? যদি তা সম্ভব হত? ভাবতেই আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। এ-জীবনে আর কখনও ঠিক ওই অনুভূতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু কেন? আমি তো তাকে ঘৃণাই করেছি। অপমানই করেছি তাকে। আগামী দিনগুলোতেও সে কি আমার কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করতে পারে? আমি তো অনেক আগেই নিজেকে চিনেছি। আমার কোনো নদীর কোনো বাঁধ ভাঙতেই তো বাকি নেই। এখন কেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি উন্মাদের মতো? নতুন কোনো নির্যাতনের জন্য?

অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এলোমেলো অন্ধকারে লক্ষ্যহীন তাকিয়ে থাকি। ভাবি, এই কি ভালো হয় নি?

ঘরে ফিরে এসে অন্তর্জ্বালা মেটানোর নানান উপায় খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি। অদ্ভুত সব স্বপ্নের আশ্রয়ে আত্মস্থ হই। এই তো ভালো হয়েছে। বাকি জীবনটা আমার অপমানের জ্বালা বুকে নিয়েই কাটিয়ে দিক মেয়েটা। ওই যন্ত্রণাই তো আত্মশুদ্ধির নামান্তর। এরই নাম ব্যথাদীর্ণ চেতনার মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা। ওর জীবন হয়তো আরও বিচিত্র, আরও অভিশপ্ত হয়ে উঠবে। তবু ওর হৃদয়ে আমার দেয়া আঘাতের অবিরাম, অবিরাম ভার কি একটুও বাঁচাতে সাহায্য করবে না?

আর তা ছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে তীব্র যে প্রশ্ন আমাকে আন্দোলিত

করছে তা হল কোন্‌টা ভালো? সস্তা সুখ? না মহিমান্বিত বেদনা? কোন্‌টা সত্যিকার কাম্য?

তো...বাসায় ফিরে মনঃকষ্টে ছিন্নভিন্ন হতে-হতে আমি অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। বুঝে নিলাম, স্বপ্ন ছাড়া আমার মতো স্বপ্নপ্রিয়, দৈন্যপীড়িত, মর্যাদাহীন মানুষের আর কিছু নেই। লিসার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হয় নি। কারুর কাছে ওর কথাও শুনি নি। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত ওই স্তোকই আমার সম্বল ছিল।

আর আজ, এতকাল পরেও এই স্মৃতি অভিশপ্ত আত্মার মতো আমাকে তাড়া করে ফেরে। আরও অনেক অশুভ স্মৃতি আছে আমার, কিন্তু গুপ্তবাসের দিনলিপি এখানে শেষ করাই ভালো হবে, কী বলেন? হয়তো ভুলই হয়েছে, হয়তো আরও ভালো হত যদি প্রথম থেকেই দিনলিপির বিবরণ শেষ করতাম। তবু বড় লজ্জা নিয়ে এ-রচনা শেষ করছি। কারণ এ যত-না সাহিত্য তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মশুদ্ধির দণ্ড। কারণ যে-কাহিনী আমার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলো ঘিরে উদ্ভূত, যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে নিজের হাতে নষ্ট করেছি এ-জীবনের অনেক সম্ভাবনা, পরিবেশের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে মেলাতে পারি নি আত্মজিজ্ঞাসা, কীভাবে সত্যিকার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেছে নিয়েছি অন্তর্মুখী, নিঃসঙ্গ গুপ্তবাসের কুঠুরি, সেই দীর্ঘকাহিনী হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে না। উপন্যাসের একজন নায়ক চাই, অথচ নায়কধর্মের বিপরীত চরিত্রই এ-কাহিনীর উপজীব্য। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, এই কাহিনী পাঠকের মনে অবাঞ্ছিত তিক্ততা এনে দিতে পারে। কারণ আমরা তো আসলে সবাই কোনো না কোনোভাবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা সবাই কমবেশি অসম্পূর্ণ, পঙ্গু জীবন যাপন করি। অনেক কষ্টে প্রায় অসাধ্য সাধনের মতোই সত্যিকার জীবনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। আর কী হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রায় সবাই একটা বিষয়ে শেষ পর্যন্ত একমত হই যে, এসব কেবল উপন্যাসেই ভালো মানায়। আমরা এগুলো নিয়ে উপহাস করতে ভালোবাসি। আমরা তো ভাই আমাদের নিজেদেরকে চিনি না। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না ; সহিষ্ণুতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে যে-উত্তরগুলো দেয়া সম্ভব হলে আরও অনেক বিড়ম্বনা সইতে হত। আসুন, পরীক্ষা করেই দেখুন না। আরও একটু স্বাধীনতা দিন ; খুলে দিন হাতের বন্ধন ; নিয়ন্ত্রণ আরও আরও একটু সীমিত করুন। দেখবেন, অবশ্যই আমরা আবার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যেতে চাইব। আমার কথায় আপনাদের রাগ হতে পারে। কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে, সব জীবন একরকম নয়। আমি জীবনে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এতদূর ঝুঁকি নিয়েছি—যার অর্ধেকটা নিতেও হয়তো আপনি রাজি হবেন না। আমাদের বেশির ভাগ লোক কী করে? কাপুরুষতাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে আত্মপ্রতারণার মধ্যেই খুঁজে ফেরে

আনন্দ। আমি এই আনন্দে বিশ্বাস করি না ; তাই আমার জীবন ওদের সবার চেয়ে বড়। তারচেয়ে ভাবনার কথা, আমাদের বেশির ভাগ মানুষ শেষ পর্যন্ত জানতেই পায় না, জীবনের আসল মানে কী, জীবন ঠিক কত বড়, কী তার পরিচয়? বই কেড়ে নিয়ে আমাদের নিঃসঙ্গ করে দিন, আমরা জানব, কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। বিভ্রান্তির শিকার হব আমরা। জানব না, শেষ পর্যন্ত কোথায় পথের শেষ, কোথায় থামতে হবে। বুঝব না, জীবনের কী কী ভালোবাসার আর কী কী ঘৃণার। কোনোদিন টের পাব না, কে আমাদের শ্রদ্ধার আর কে নিন্দার পাত্র। মানুষ হয়ে জন্মানো যে কী বিড়ম্বনা! সত্যিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর রক্তের ধারা চিরদিন আমাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন করে। আমাদের মধ্যে সঙ্কোচ জাগিয়ে তোলে। শেষে ভাবি, কী দরকার অত ঝামেলার মধ্যে গিয়ে? সিদ্ধান্ত নিই, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সাধারণ মানুষ হওয়া—অস্বাভাবিক এক ধরনের সাধারণ মানুষ। আমাদের জন্মই তো ভাই মৃতাবস্থায়। পুরুষানুক্রমে আমাদের এই যে জন্ম—মৃতের মতো শুরু, মৃতের মতো শেষ—এর মাঝখানে ছুঁচোর কেত্তন ছাড়া আর কী আছে? কোনো জীবিত পিতা আমাদের জন্ম দেন না। এই জীবনেই আমরা অভ্যস্ত, এ থেকেই জীবনের সব স্বাদ আহরণ করতে চাই। শিগগিরই আমরা এর বদলে নতুন কোনো ধারণা নিয়ে জন্মানোর কায়দা শিখে ফেলব ; কোনো একটা উপায় নিশ্চয় বেরুবে। কিন্তু থাক, মূষিকের এই গর্ত থেকে আর একটি কথাও নয়।

[এক খামখেয়ালি লেখকের এই যে বাণী—শুনে হঠাৎ খাপছাড়া মনে হলেও আসলে যার ভিতরে একরত্তি মিথ্যে নেই—এখানেই শেষ নয়। আরও অনেক বাণী ছিল তার। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এখানে শেষ করলেও চলে।]